সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

উনঅশীতিতম্ বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

"...বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় প্রচেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালীর চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালী চিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীর্ত্তিকে, পিতৃ-সাধনাকে এইরূপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে—দেশপুত্রও দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে বৃহৎ কালে ঐক্য দান করিয়া তাহাকে সত্য করে, তাহাকে চরিতার্থ করে। সাহিত্য পরিষৎও বাংলাদেশের চিত্তকে এইরূপ নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে মহৎ রূপে সত্য করিয়া তুলিবার আশা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি...।"

—রবীন্দ্রনাথ

[১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠানের ভাষণ হইতে উদ্ধৃত]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

উনঅশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
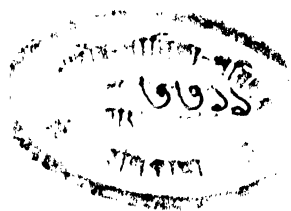
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

"...বাংলা দেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,—এমনি করিয়া অনেক নবীন আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই সকল অপমানিত মঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে—তাহারাই আমাদের উন্নতি পথের এক একটি বড় বড় বাধা রচনা করিয়া রহিয়াছে। বাংলা দেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্য-পরিষৎরূপে আমাদের দর্শন গোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের আনুকূল্য প্রসারিত হউক। —বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অদ্য এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্য লিপি লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীর্ত্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক।"...

—রবীন্দ্রনাথ

[১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠানের ভাষণ হইতে উদ্ধৃত]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭৯ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

প্রতি সংখ্যা : দুই টাকা

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

"...ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, অথবা-যে কোনও নূতন তত্ত্ব আলোচনা যোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মুখ্যতঃ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি লইয়া সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বানুসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ সীমা মধ্যেও পরিষদের বিশাল কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে ..."।

"...বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত। জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি-পত্রের ভিতরে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল পুঁথিকে জল আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। পুরাতন মন্দির ও জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সহিত যে সকল পুরাতন কিংবদন্তী বিজড়িত আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া, বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাসের যথা সম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। মহিলা সমাজে প্রচলিত ব্রতকথা উপকথা ইত্যাদি হইতে এবং সামাজিক পূজা উৎসব ক্রীড়া প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে, অপিচ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি হইতে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি পুরাতন দলিল প্রভৃতি বঙ্গদেশের রাষ্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কৃত করিতে হইবে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উপভাষা এবং অপভাষা আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গঠন প্রণালী নির্ণয় করিতে হইবে। এই সমুদয় ও আরও বৃহৎ কার্য্য সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে রহিয়াছে। এই কর্ত্তব্য সাধনে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাই সাহিত্য পরিষদের প্রধান মুখপত্র। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সাহায্যে সর্ববিধ জ্ঞান প্রচার এবং শিক্ষা বিস্তার করিবার চেষ্টা উপযুক্ত হইবে না, কারণ ইহা একটি তত্ত্বানুসন্ধিনী সভার মুখপত্র। ইহা দ্বারা সেই সভার কার্য্যফল গবেষণার ফল অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর হস্ত হইতে নূতন গবেষণার ফলে যাহা কিছু আবিষ্কার হইবে পরিষৎ পত্রিকা তাহা সাদরে বহন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে। বঙ্গদেশের ভূবিদ্যা, অন্তরিক্ষবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে নূতন গবেষণার প্রচুর অবসর রহিয়াছে। বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার গাছপালা, বাঙ্গালার জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবিষ্কারে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত উদাসীন রহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গদেশের বৈজ্ঞানিকেরা যে কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা তাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছে। এমনকি পদার্থবিদ্যা রসায়নাদি শাস্ত্রেও নূতন অনুসন্ধানের ফল বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিগণের হস্ত হইতে প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষৎ কৃতার্থ হইবেন এবং পরিষৎ-পত্রিকাও গৌরবান্বিত হইবে...।"

(১৫শ বার্ষিক কার্য বিবরণ হইতে)

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ

প্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

বাংলা অনুবাদ নাটকের ইতিহাসে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের স্থান উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানা যায় তাতে উনবিংশ শতকে সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। অনুবাদ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে মূল সংস্কৃত নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয় এবং তার রচয়িতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের মত কৃষ্ণমিশ্রের সময় নিয়েও বুধমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক কীথ্ কৃষ্ণমিশ্রের সময় মোটামুটিভাবে খৃষ্টপর একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলে নির্দেশ করেছেন।[১] শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বলেছেন[২]—

"কৃষ্ণমিশ্রকে [১১শ-১২শ শতক] কেহ কেহ [দ্রষ্টব্য চিন্ময় বঙ্গ, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ১২০] বাঙালী মনে করেন। কিন্তু নাটকের যে শ্লোক—

[গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢ়াপুরী ভূরিশ্রেষ্ঠিক নামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা। তৎপুত্রাশ্চমহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্য এতেষামপি প্রজ্ঞাশীল-বিবেকধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ॥ ২।৭]—ইহা অহঙ্কারের উক্তি। ইহাতে নাট্যকার সম্ভবতঃ তদানীন্তন বাঙালী পণ্ডিতের অহমিকার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই শ্লোকে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নাই। এই নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পালরাজ গোপাল কিনা জানা যায় না। গোপাল কোন বিশেষ রাজার নাম না হইয়া রাজ পর্যায় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে; 'নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, "গাং ভুবং পালয়তীতি গোপালঃ।"

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় বলেছেন—

"কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিম্নোক্ত শ্লোকটি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ 'অহঙ্কার'-এর উক্তিঃ—

১। The Sanskrit Drama—Prof. A. B. Keith, P. 25
'তুরস্কদেশাগত ব্যক্তি'র প্রতি ঘৃণা প্রকাশ দেখা যায় এই নাটকে। অতএব এই নাটকের রচনাকাল দ্বাদশ শতকের পূর্বে নয় বলেই মনে হয়।

২। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা ১২০-১২১।

"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ। বেদান্তা যদি শাস্ত্রানি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে ॥" ৩ ইহার অর্থ এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না, এরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ কি?—ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে বাঙালী তৎকালে [খৃঃ ১১শ শতকের শেষার্ধ] বেদান্ত দর্শনের প্রতি হতাদর ছিল। কিন্তু, এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন বাংলায় দর্শনচর্চার অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিম্বা রাঢ়দেশের প্রতি নাট্যকারের কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, রাঢ়দেশ সমগ্র বঙ্গদেশের একটি অংশ মাত্রকেই সূচিত করে। এই শ্লোকে বৌদ্ধগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে।"

সুরেশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে জানা গেল—১। কৃষ্ণমিশ্রের সময়কাল ১১শ-১২শ শতক ১। সঠিকভাবে বলা যায় না যে কৃষ্ণমিশ্র বাঙালী ছিলেন কিন্তু তিনি বাঙালী ছিলেন না—একথাও তিনি বলেননি।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রাচীনতম বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' [১৮২২ কিন্তু এর পূর্বে এ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় [১৮১২ খ্রষ্টাব্দে] বলে সংবাদ পাওয়া যায়। ৪

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানূদিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও একখানি বাংলা মৌলিক নাটকের রচনায় এ গ্রন্থের প্রভাব সবিশেষ। গ্রন্থটি হোলো—মহাতাব চাঁদ ঘোষ রচিত মঞ্চসফল নাটক 'আত্মদর্শন' [১৯২৫]।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত বাংলা নাটকের তালিকায় গ্রন্থটির নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রী সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনা গ্রন্থে, আত্মদর্শন গ্রন্থের মোটামুটিভাবে আলোচনা করে প্রসঙ্গত আত্মতত্ত্বকৌমুদী ও বোধেন্দুবিকাশ নাটকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,—

"ইহাতে প্রকৃতি নিবৃত্তির ক্রীড়া দেখানো হইয়াছে। এগুলি নাটকীয় সার্থকতা নাই,

৩। "কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ভুরশুট গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ 'অহঙ্কার'-এর ভূমিকায় তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আছে"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮, ১৯৪৮ সং।

৪। Catalogue of Sanskrit & Pali Books in the British Museum by Dr. Ernst Haas, Edited in 1876—First Edition এর 69 page-এ বলা হয়েছে…

Prabodh Chandrodaya, or the Moon of Intellect, an allegorical drama, and Atma Bodh, or the knowledge of Spirit (by Sankara Acharya) Translated from the Sanscrit and Pracrit by J. Taylor with appendix containing an analysis of the two pieces. London, 1812.

আত্মদর্শন কিন্তু সার্থক নাটক।" ৫ কিন্তু ১৯ শতকের প্রথমভাগ থেকে ২০ শতকের প্রথমভাগের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের-অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং প্রায় একশোবছর ধরে এ নাটক রূপক বা রূপকাশ্রিত নাটক রচনায় বাঙ্গালী নাট্যকারদের অনুপ্রেরণা দান করে।

এবার বঙ্গানুবাদিত নাটকগুলির মূল আলোচনায় আসা যাক। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত বঙ্গানূদিত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায়—

১। আত্মতত্ত্বকৌমুদী: কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি—১৮২২ খৃষ্টাব্দ।

২। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক: গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ।

৩। মনোযাত্রা নাটক: পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর—১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

৪। বোধেন্দুবিকাশ নাটক: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কলকাতা—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ।

৫। প্রবোধচন্দ্রোদয়: বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন-[১২৪৬ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]।

৬। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক: আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণ, বাং ১৩০০ সাল।

৭। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০২ খৃ:, ১৩০৮ সাল।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি রচিত আত্মতত্ত্বকৌমুদী:—

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—

"উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে 'নাটক' নামে অনেক বই গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে লেখা হইয়াছিল।...এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রূপক নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ অনেকগুলিই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু দুই-একটি ছাড়া কোনটিই নাটক আকারে নয়। সবচেয়ে পুরানো অনুবাদ হইতেছে 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' [১৮২২]" ৬

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' রচনাকে 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম ধাপ'[৭] বলে উল্লেখ করেছেন।

৫। "মহাতাপচন্দ্র ঘোষের এই নাটকখানি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট শনিবার তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে।...নাটককার ২৮ খানি ইঙ্গিতপূর্ণ গানের ভিতর দিয়া গদ্য ও গৈরিশ ছন্দের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় এই রূপক নাটকটি রূপায়িত করিয়াছেন।"—দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৯৮-৯৯।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৪২-৩। এ গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে ডঃ সেন 'অজ্ঞাত নামা লেখকের রচনা 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' বলেছেন।

৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫।

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি[৮] নিম্নরূপ—

শ্রীশ্রীহরি : শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ—উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁয় হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর—জ্ঞান অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগ ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান গ্রন্থনাম আত্মতত্ত্বকৌমুদী শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন, শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি, এই গ্রন্থের নাট্য শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞা শব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকাদির লক্ষণ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদি ক্রমে দৃষ্টি করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রা চতুষ্টয় মাত্র। মহেন্দ্রলাল প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল সন ১২২৯ সাল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থে[৯] 'সমাচার দর্পণ' থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন সে উদ্ধৃতিতে গ্রন্থরচয়িতা তিন ব্যক্তির দ্বিতীয় জনের নাম 'গঙ্গাধর' স্থানে 'গদাধর' উল্লিখিত হয়েছে। সমাচার দর্পণের হুবহু উদ্ধৃতিটি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হোলো :—

"১৭ই আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র—১২২৯।

নূতন পুস্তক। মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমিশ্র প্রণীতাধ্যাত্ম বিদ্যাবোধ প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্বকৌমুদী রাখিয়াছেন ঐ গ্রন্থে ছয়

৮। গ্রন্থটি বাংলাদেশের কোন গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার থেকে মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করেছি। ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহের নিদর্শন পত্রটি নিম্নরূপ :—

British Museum.

Department···O. P.B.

Catalogue...14079. C. 33. Order Ps 6/13060

Author—Krishna Misra.

Title--A Bengali Paraphrase of the Prabodha Chandrodaya.

Place and Date of origin—1822

British Museum Photographic Service, London.

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪,।

অঙ্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ একশত পৃষ্ঠা।"

সমাচার দর্পণ পত্রিকার উপরোক্ত নূতন পুস্তক সমাচার [সমালোচনা বলা চলে না, কারণ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই] বৃত্তান্তের মুদ্রণ-প্রমাদকেই [গঙ্গাধর স্থলে গদাধর] সত্য বলে গ্রহণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে রচিত আত্মতত্ত্বকৌমুদীর অন্যতম গ্রন্থকার কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননের জীবনী ও কর্মজ্ঞানপ্রয়াসের বিবরণদান প্রসঙ্গেও একই মুদ্রণ-প্রমাদকে অনুসরণ করেছেন[১০]।

'আত্মতত্ত্বকৌমুদী'র তিনজন গ্রন্থকারের দুজনের [গদাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি] জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।[১১] সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ডে ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সমাচার দর্পণ-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের [পৃ: ২৯] সারমর্ম থেকে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে জানা যায়:—

"...গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন পাদরি উইলিয়াম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুইশত ও একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৩ সনে সিমুলিয়ার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা বিভাগের একজন সহকারী পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ১৮২৫ সনের নবেম্বর (?) মাসে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

১০। দ্রষ্টব্য—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড [১৮১৮-১৮৩০], শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৬।

১১। সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা; পরবর্তীকালে প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থাদি বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সমূহের মুদ্রিত পুস্তকতালিকা; ক্যালকাটা রিভিউ; ওলং সাহেবের ক্যাটালগ; ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ; থিওডোর আউফ্রেকৃট-এর 'ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরাম'; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থ ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান' গ্রন্থ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও আমি গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও রামকিঙ্কর শিরোমণি সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এমনকি এসম্বন্ধে বাংলাদেশের সমস্ত পণ্ডিতসমাজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি।

এই পদে আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া ১৯এ নভেম্বর হইতে মাসিক ৮০ বেতনে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস হইতে ১৮৩১ সন পর্যন্ত ২৪ পরগণার জজপণ্ডিত ও সদর-আমিনের কাজ করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। তবে ১২ মার্চ ১৮৪৭ হইতে তিনি মাসিক ৪০.০০ বেতনে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে আমরা তাঁহাকে কলেজে গ্রন্থাধ্যক্ষ রূপে দেখি। ৮ নভেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে কাশীনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে [আত্মতত্ত্বকৌমুদী ছাড়া] উল্লেখযোগ্য হোলো :—পদার্থ কৌমুদী [১৮২১], পাষণ্ডপীড়ন নামক প্রত্যুত্তর [১৮২৩], সাধুসন্তোষিনী [১৮২৬] এবং শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র (?) উল্লেখযোগ্য। [১২] বলা বাহুল্য 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' নাটকাকারে রচিত নয়। মূল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোকগুলির বাংলা সাধুভাষায় উপাখ্যানাকারে গদ্যানুবাদ এ গ্রন্থে সম্পাদন করা হয়েছে। অনুবাদকালে শ্লোকের সংখ্যাগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নমুনাস্বরূপ গ্রন্থের ১০০-১০১ পৃষ্ঠার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হোলো :—

> "একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কি [১২] আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনুপুর, কুঙ্কুমের রাগ, সুগন্ধি কুসুমরচিত আশ্চর্য্যমালা এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তা হারাদির শোভাতে শোভিত কিন্তু ফলতঃ রক্তমাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তলোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞান দৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎবস্তুর বাহ্য অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মল-মুত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে।"

গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক :—

আত্মতত্ত্বকৌমুদীর আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশেষ প্রয়োজন

১২। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী ও রচিত গ্রন্থাদি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১৪ সংখ্যক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম খণ্ডেও কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

সমাচার দর্পণ পত্রিকার ৩রা ডিসেম্বর ১৮২৫ [১৯শে অগ্রহায়ণ ১২৩২] ও ১ই জুন ১৮২৭ [২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪] এর দুটি সংবাদে ["পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত" শিরোনামায়] কাশীনাথের দুটি কর্মে যোগদানের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী আলোচনার দুটি বিষয় এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি—১। আত্মতত্ত্বকৌমুদী নাটকাকারে রচিত নয় ২। আত্মতত্ত্বকৌমুদীর অন্যতম রচয়িতা কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। লক্ষণীয় বিষয় হোলো—১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আত্মতত্ত্বকৌমুদীর তিনজন লেখকের দ্বিতীয় জন গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন সুনামে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পূর্বতন বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর রচিত পরবর্তী গ্রন্থে সামান্যতম উল্লেখও করেননি।[১৩] এবিষয়ে বক্তব্যবিষয় আরো সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটনের জন্য গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের বঙ্গানুবাদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের [১৮৫২ খৃষ্টাব্দ—এবং পরে এ গ্রন্থের ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেও আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়] আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

আলোচ্য গ্রন্থটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ :—

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রণীত। কলিকাতা। শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি যন্ত্রে মুদ্রিত শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন বলেছেন—

"অবিরত সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহার্থে নিপুণতর চিত্ত ব্যক্তিদিগের বিবিধ পাতকরূপ নিবিড়তম তিমির রাশিতে বিজ্ঞানময় কোষকে সর্ব্বাবয়বে গ্রাস করাতে নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ ফললাভের নিতান্তই অসম্ভাবনা, যেহেতু উপনিষৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নাদিস্বরূপ জ্যোতির উদয় হইয়া তাদৃশ ঘনান্ধকার ধ্বংস না করিলে তথাবিধ ফললাভ কদাচ সম্ভবে না, পরন্তু তত্তাবৎ শাস্ত্র অত্যন্ত দুরূহ এইহেতু পরম কৃপাময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র পণ্ডিত নাট্য-কৌতুক প্রসঙ্গ সঙ্গতি দ্বারা অল্পজ্ঞ লোকদিগের অনায়াসে মনোভিলাষে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ার্থে প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক কাব্য-রচনা করেন যাহা অত্যন্ত ব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেও তত্ত্বাষার্থ ঘোরার্থরূপ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সাধারণ জনসন্নিধানে সুস্পষ্টরূপে আলোকময় দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এক্ষণে কর্তৃকক্রিয়াদির প্রয়োগ বিশেষে কোমল শব্দবিন্যাসে অতিশয় আয়াসে তদীয়ার্থ সুনির্যাসে সংশোধিত হইয়া মূল শ্লোকের সহিত উত্তমকাগজে সুন্দর অক্ষরে পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৩। তিনজনের অনূদিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাৎ করার মানসেই শ্রীন্যায়রত্ন একাজ করেছেন—এসন্দেহ করা বোধহয় অমূলক নয়। বিশেষত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জীবিতকালে একাজ করতে শ্রীন্যায়রত্ন সাহসী হননি। তাই, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গ্রন্থের আত্মতত্ত্বকৌমুদী নাম পরিবর্তন এবং গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতুনভাবে স্বনামে গ্রন্থ প্রকাশ করে অনুবাদ কর্মের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন আত্মসাৎ করেছিলেন একথাই প্রমাণিত হয়।

"গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতার ডিঙ্গাভাঙ্গার শাঁখারিটোলার গলিতে ৫৭ নং বাটীতে অন্বেষণ করিলে এই পুস্তক পাইবেন।—শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন কলিকাতা সন ১২৫৯ সাল ২৫ অগ্রহায়ণ।"[১৪]

গ্রন্থের 'নির্ঘণ্ট পত্র'তে ছটি অঙ্কের নামকরণ [এমনকি বানান পর্য্যন্ত] আত্মতত্ত্বকৌমুদীর মতো। ১৮৫ পৃষ্ঠার গদ্যে অনুবাদকর্ম [গৌড়ীয় সাধুভাষায়] সম্পাদিত। মোট ১৮২টি শ্লোকের গদ্যানুবাদ আছে।

এবার অনুবাদের নমুনাস্বরূপ প্রথমাঙ্কের ২-সংখ্যক শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ [মূল শ্লোক সহ] উদ্ধৃত করা হোলো—

মূল শ্লোক—

অন্তর্নাড়ী নিয়মিত মরুল্লঙ্ঘিত ব্রহ্মরন্ধ্রং
স্বান্তে শান্তি প্রণয়িনি সমুন্মীলনানন্দ সান্দ্রং।
প্রত্যগ্জ্যোতির্জয়তি যমিনঃ স্পষ্ট ললাটনেত্র
ব্যাজব্যক্তী কৃতমিব জগদ্ব্যাপি চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ

জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের যে চৈতন্য মূর্তিজ্যোতিঃ সুসুম্না নাম নাড়ীতে নিবদ্ধ যে প্রাণবায়ু তাহার অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করিয়াছে, এবং শান্তরসে নিমগ্ন যে মানস তদ্দারা যাহা নিবিড় আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে, এবং যে চৈতন্য রূপ জ্যোতিকে মহাদেব আপনার ললাটস্থ লোচনের ছলেতে প্রভাপটলের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শিবের ললাটনেত্র নহে বুঝি চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিঃই ললাটভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এবম্ভূত মহাদেবের সেই চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিকে আমরা প্রণাম করি ॥ ২ ॥

লক্ষণীয় বিষয় হোলো মূল নাটকের ঘটনা বা অ্যাকসন ও কথোপকথন অংশের

১৪। গ্রন্থ রচনার রীতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বক্তব্য 'বিজ্ঞাপন'-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল। কিন্তু যদিও তিনি বলেছেন—'যাহা অত্যন্ত ব্যবহিত পূর্বে... পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইল' তবু এ স্বীকৃতির মধ্যে 'ব্যবহিত পূর্বে গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ' গ্রন্থের নাম এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের নাম প্রকাশ [যা অত্যন্ত প্রয়োজন ও স্বাভাবিক] করা হয় নি। সুতরাং পূর্বেই বলেছি—এ সন্দেহ নিশ্চয়ই অমূলক নয় যে শ্রীন্যায়রত্ন পূর্ববর্তী অনুবাদ গ্রন্থ-রচনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাৎ প্রয়াসে প্রয়াসী হন। এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত তথ্য জানা যেতো যদি শ্রী ন্যায়রত্নের জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন বিবরণ পাওয়া যেতো।

সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়নি কিন্তু চরিত্রগুলির নীতিবাক্য সদৃশ সংলাপগুলির মূল সংস্কৃত ও তারসঙ্গে বঙ্গানুবাদ [সাধুভাষায় গদ্যে] দেওয়া হয়েছে।

আত্মতত্ত্বকৌমুদী বা গঙ্গাধর ন্যায়রত্নের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান-সংবাদ সমসাময়িক পত্র পত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যায় না।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—'মনোযাত্রা নাটক'

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :

মনোযাত্রা নামক নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর প্রণীত। শ্রীরামপুর। চন্দ্রোদয়যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৮৪। এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি জীলা হুগলার ইস্মলকাজ কোর্টের নাজীর অথবা কলিকাতার শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনকমটেক্স আপীশের হেড এসিস্টেন্ট বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলে পাইবেন। মূল্য ১ টাকা।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"গ্রাম্য বালকসকলে শারদীয় মহাপূজাকালে আনন্দোৎসব ছলে বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসুন্দরাদি নাটক কোকিলকণ্ঠে সংগীত করত সাধারণের সুখবর্দ্ধন করা দৃষ্টে অস্মদের মনে এই মানস হইয়াছিল যে পরমার্থতত্ত্ববোধক আনন্দজনক কোন নাটক ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক এই সকল বালকদিগের দ্বারা গান করাইলে তাহা শ্রবণে শ্রবণের সার্থকতা ও মনের মলিনতা দূর হইয়া শ্রবণমনঃ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেক, এই বাসনার তোষণা কল্পনায় সংস্কৃত নানা নাটক পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত জ্ঞানানন্দরসযুক্ত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকসদৃশ অন্য দৃষ্ট না হইয়া তদাভাসক্রমে ভাষাতে নাটক রচনা করণের অভিলাষ হয়; ১২৬৩ বঙ্গাব্দে মোছলমানদিগের পর্ব্ব এবং অস্মাদাদির দুর্গোৎসব প্রযুক্তমাসদ্বয় রাজকার্য্য হইতে অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্ক রচনা করিয়া বালকদিগকে সুশিক্ষিত করাইয়া তাহারদিগের দ্বারা মহোৎসবদিবসে সংগীত করাণ যায় তবচ্ছ্রণে বিচক্ষণ শ্রোতাগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উৎসাহ প্রদান করাতে সাহস বৃদ্ধি হইয়া পর বর্ষে তৃতীয় অঙ্ক প্রণয়ণ করা হয়, তদনন্তর রাজকার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত অবসরাভাব হইবাতে গ্রন্থ সমাপ্ত করণের সময় প্রাপ্ত হই নাই। মুরসিদাবাদনগরে ছোট আদালতের জজের পদে ১২৬৮।৬৯ বঙ্গাব্দে আমার নিযুক্ত থাকাকালে অসৌভাগ্যক্রমে আমার সুশীল কনিষ্ঠ পুত্র যে প্রাণতুল্য ছিল এবং প্রিয়োত্তমা পত্নী ক্রমে করালকালের বশতাপন্ন হইবায় অবসন্নচিত্ত হইয়া শোকসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার তরি স্বরূপ শান্তিরস কথা জানিয়া এই গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক রচনা করা হয়, জগদীশ্বরের কৃপায় এই উপায় অবলম্বনে স্ত্রী পুত্র বিয়োগজনিত গুরুতর শোকে অনেক সম্বরণ ও মনঃস্থির করণে সক্ষম হইয়াছি; এক্ষণে বিচক্ষণ বন্ধুগণে এ গ্রন্থ প্রকটনে সাধারণের চিত্তবিনোদ ও উপকার হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা

করায় মুদ্রাঙ্কণে অনুমতি দিলাম। এ গ্রন্থে যে বিষয়ের চর্চ্চা করা হইয়াছে তাহা বিষয়ী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এতাদৃশ সুকঠিন যে বিশেষ মনোভিনিবেশ ব্যতীত ইহার মাধুর্য্যরসের তাৎপর্য্যানুভব হইতে পারে না।" গ্রন্থরচনার রীতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন :—

"সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবার কারণ যে পর্য্যন্ত সুলভ ও সহজ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা হইয়াছে, ও পদ সকল কোমলচলিত শব্দে রচনা করা গিয়াছে; বালকদিগের দ্বারা সংগীত হইবার কারণ রাগ ও তাল প্রায় কঠিন প্রয়োগ করা হয় নাই, তদ্ধেতুক যদিচ রচনার পারিপাট্য হইতে পারে নাই; তথাপি বঙ্গভাষাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের এরূপ নাটক পূর্ব্বে কেহ যে রচনা করিয়াছেন ইহা দৃষ্ট না হওয়ায় এবং সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার সুলভ হইলে সাদরে সকলে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সুখী হইতে পারিবেন এই প্রত্যাশায়, বিজ্ঞ, গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ, ব্যক্তিবর্গের নিকট বিনয় পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি যে অনুগ্রহপূর্ব্বক অজ্ঞের রচনার দোষালোচনাবিনির্ম্মুখে অবকাশ কালে পাঠ করিয়া যে নিগূঢ়রস ইহাতে আছে তাহার আস্বাদনে আনন্দ অনুভব করিবেন।"

পঞ্চমঅঙ্কে ১১৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। গদ্য অংশের স্থানে স্থানে সংলাপ আছে আবার কোথায়ও বা উপাখ্যানাকারে বর্ণনা আছে। পদ্যাংশ বিভিন্ন বাংলাছন্দে লিখিত হয়েছে। রাগরাগিনী তাল উল্লেখসহ অনেকগুলি গান আছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানগুলি সংলাপাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গণেশ-বন্দনা, ভগবতী-বন্দনা, নিগুর্ণ-ভজনা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। অনুবাদ কর্ম যথাযথ নয় বরং স্থানে স্থানে পরিবর্জিত অথবা পরিবর্ধিত হয়েছে :—সাধারণভাবে ভাবানুবাদ রীতি অনুযায়ী অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হলেও কর্মের ক্ষেত্রে গীতাভিনয়-ধর্মী বলা চলে। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অস্যার্থঃ' বলে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যের সংখ্যা উল্লিখিত না হলেও দৃশ্য বিভাগ [ছোট ছোট পর্যায় আকারে] করা হয়েছে।

নাট্যকর্মের নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্ক থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক :—

কথা

মহামোহ কহিলেন হাঁ তাহারে শীঘ্র আহ্বান কর, যদ্যপি সুযোগ্য হইয়া থাকে তবে উপস্থিত যুদ্ধে শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হউক। ক্রোধ মহামোহের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিজ-সন্তান দ্বেষকে আহ্বান করিতেছেন, ওরে বাপু দ্বেষ! দ্বেষ বলে, কেরে বেটা এতরাত্রে আমায় ডাকাডাকি করিতেছিস ?

রাগিনী মালকোস বহার, তাল আড়্ খেমটা।

এতরাত্তিরে তুই কেরে আমায় ডাকছিস বেটা।

আমি শুয়েছিলাম মনের সুখে দুপুর রেতে একি লেঠা ।।
বধূর সঙ্গে, প্রেম প্রসঙ্গে, ছিলাম আমি নানা রঙ্গে।
সে সুখে করিলি ভঙ্গ, তোর মুখে মারিব ঝাঁটা ।।[১৫]

দ্বেষ

তখন দ্বেষ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন পিতা ক্রোধকে দৃষ্টি করিয়া বলে কে ও বাবা! তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে? নতুবা এমত অরসিক কে আছে, বাবা নামেও যেমন কর্ম্মেও তেমন, সদাকাল রেগেই আছ সংসারের মজা কিছুই জানিতে পারিলে না। ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দন্ত কট্‌মট্‌ ধ্বনিপূর্ব্বক পুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া বলিতেছেন ওরে নির্ব্বোধ কাহাকে কিরূপ সম্বোধন করিতে হয় তাহা তোমার বোধ নাই, এবং অস্মাদাদির উপস্থিত ঘোর বিপদ সময়ে তোমার আমোদ প্রমোদের কথা! আর কি বালক আছ, উপযুক্ত হইয়াছ, ঐ দেখ তব পিতামহ মহারাজ মহামোহ বিষণ্ণবদনে আছেন, কোন তত্ত্ব রাখ না। দ্বেষ বলিতেছে কেমন ২ কি বিপদ উপস্থিত? ক্রোধ উত্তর করিলেন ওরে, কর্ত্তা পিতাঠাকুরের প্রমুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ কর।

উদ্ধৃত নমুনায় লক্ষণীয় হোলো—১। ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ—যা সেযুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই [বিশেষত গদ্য রচনায়] দেখা যেত। ২। সংলাপে নাটকীয়তা থাকলেও সংলাপলেখ্য-রীতি উপাখ্যানানুগ।

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাস নাটক'

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :—

বোধেন্দুবিকাশ নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ—অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ি বর্ণন মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুত রামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নং ৫৪। ১২৭০ সাল। পৃষ্ঠা-১৪০।

কবির জীবিতকালে নাটকখানির অংশ বিশেষও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর চারবছর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত বোধেন্দুবিকাসের প্রথম খণ্ড [অসম্পূর্ণ—প্রথম তিনঅঙ্ক মাত্র] প্রকাশ করেন এবং রামচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত গ্রন্থের আখ্যা পত্রটিই উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এ নাটকের পরবর্ত্তী [দ্বিতীয়] খণ্ড [বাকি তিন অঙ্ক সহ] রামচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। রামচন্দ্রের দৌহিত্র [একমাত্র কন্যার পুত্র] মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় পরবর্ত্তীকালে 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে [২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ মেডিকাল লাইব্রেরী

১৫। তখনকার দিনের যাত্রা—'কালুয়া-ভুলুয়া'দির প্রভাব।

থেকে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকশিত, ১৩০৭ সাল, মূল্য ৪.০০ পৃষ্ঠা সংখ্যা —২৭৪] এ নাটকের সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়।[১৬] সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে 'নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ' শীর্ষক অধ্যায়ে ১২৭০ সালে প্রকাশিত বোধেন্দুবিকাস গ্রন্থেরই [আংশিক] উল্লেখ করেছেন।

'বোধেন্দুবিকাস' গুপ্ত কবির পরিণত বয়সের [মাত্র ৪৭ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন] রচনা। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে প্রথম এটি প্রকাশিত হতে থাকে, ১২৬৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'উপক্রমণিকা'তে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন :—

"মদগ্রজ মহাকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রূপকপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সুললিত গদ্য-পদ্য পূরিত 'বোধেন্দুবিকাস' নামক যে নাটক বিরচন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে আমি এই প্রথমভাগে তাহার প্রথম তিন অঙ্ক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ করিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পরম-জ্ঞানানন্দ-প্রদ নাটক প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে[১৭] প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কবিবর ইহার কোন কোন স্থানে পুনর্ব্বার সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং নূতনরূপে রচনা করেন, মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে গ্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং একভাগে সমুদয়াংশ প্রকাশ করা বিবেচনা

১৬। ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণের ১২১-২২ পৃষ্ঠায় [এবং ফুটনোটে] বলেছেন :—

ঈশ্বরগুপ্তের রচনা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার জীবৎকালে অথবা মৃত্যুর পরে যেসব রচনা পুস্তিকা কিংবা গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে তাহা সবই পুনর্মুদ্রণ। 'কালীকীর্ত্তন' [১২৪০ সাল], 'ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন বৃত্তান্ত' [১২৬৩ সাল], 'প্রবোধ প্রভাকর' [চৈত্র ১২৬৪ সাল] 'হিত প্রভাকর' [চৈত্র ১২৬৭ সাল], 'বোধেন্দুবিকাস' [১২৭০ সাল]। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর সঙ্কলন খণ্ডও প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৯২-৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৩০৬ সালে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে এবং ১৩০৭ সালে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭। সমগ্র নাটকটি ১২৬৪ সালের মাসিক সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (২রা বৈশাখ ১ম ও ২য় অঙ্ক, ১লা জ্যৈষ্ঠ ৩য় অঙ্ক, ২রা আষাঢ় ৪র্থ অঙ্ক, ১লা শ্রাবণ ৫ম অঙ্ক এবং ২রা ভাদ্র ৬ষ্ঠ অঙ্ক)।

সিদ্ধ হইল না, বিশেষতঃ তাহাতে আবার কালবিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, এই নাটকের উদ্দিষ্ট বিষয়টি বাহিরের নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, ফলতঃ সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান যতদূর পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কবিবর পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিত্ত তাহাতে প্রযত্ন ও পরিশ্রমকরণে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাঁহারদিগের কার্য্যের সমাধানার্থে প্রত্যেক বিচারাদি উক্তির শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে···।"

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অনুসরণে 'বোধেন্দুবিকাস' রচিত হলেও অনুবাদ কর্ম [মর্মানুবাদ] অধিকাংশ স্থলে এবং বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে—সুতরাং বোধেন্দুবিকাসকে 'প্রবোধচন্দ্রোদয় অনুসরণে ঈশ্বরগুপ্তের মৌলিক রচনা' বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। মূল নাটকানুযায়ী অঙ্ক বিভাগ বা অঙ্কের সংখ্যালেখ বিচ্ছিন্নভাবে আছে যদিও ষষ্ঠ অঙ্ক আলাদাভাবে নেই—ঘটনাগুলি মূলানুযায়ী বর্তমান নেই। সরল গদ্য এবং তরঙ্গলহরী ত্রিপদী, পয়ার, প্রকৃতি, বীরবিলাসিনী, রণরঙ্গিনী, ভঙ্গত্রিপদী, সুরশিঙ্কা, মোহিনী, উন্মাদিনী, পঞ্চাল, সুধাতরঙ্গিনী, মালতীলতা, চপলামালা, ললিতচৌপদী, মালিনী, চপলাগতি, লঘুত্রিপদী, আমোদিনী, সেফালিকা, শাসক, রোহিনী পয়ার, হিল্লোল, বিনোদিনী, যষ্ঠপদী, গৌরবিনা, তোটক, করালী, প্রভৃতি চলিত— অচলিত সংস্কৃত মূলছন্দ এবং একাধিক ছন্দের মিশ্রণে [মিশ্র ছন্দ] রচিত ছন্দে পদ্যে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। নতুন নতুন সংস্কৃত ছন্দের শুধু সার্থক অনুশীলনই করেননি গুপ্তকবি, নিজের রচিত বহু গান ও কবিতার সংযোজন করেছেন নাটকখানিতে। গুটিকয়েক হিন্দি গানও সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলা ও হিন্দী মিশ্রিত তাঁর মধুর ভজন ও দোঁহাগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক সমালোচনা গ্রন্থে।

নাটকের নামকরণের পরিবর্তন ['প্রবোধচন্দ্রোদয়' স্থলে 'বোধেন্দুবিকাস'] লক্ষণীয়। এবার বোধেন্দুবিকাস নাটকের রচনার আলোচনায় আসা যাক।

"ওকথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ্ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাস্‌বে লোকে। হাস্‌বে লোকে ॥
বলহে, বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত,
বোল্‌তে হোলো মনের দুখে। মনের দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষয় সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি,
সাপের মুখে। সাপের মুখে ॥
কাণার চোখে চশমা দিয়ে, কার্য্যকিবা আছে।
পতিব্রতা ধর্ম্মকথা, বারাঙ্গনার কাছে ॥

কালার কাছে কাব্যকথা, কি তোমার ভ্রান্তি।
চোরের কাছে পুণ্যকথা, বীরের কাছে শান্তি ॥
রসের কথা বোল্লে ভাল, এমন্ রসিক্ চাইতো।
তোমার মত রসের সাগর কোনখানে নাইতো
বোঝাপড়া হবে পরে, ঘরে আগে যাইতো।
তাইতো বটে, তাইতো বটে, তাইতো,
তাইতো, তাইতো… ॥

—'বোধেন্দুবিকাস নাটকের' প্রস্তাবনায় নটীর উক্তি এটি। ছড়ার ছন্দে হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় কবিতাটি রচিত। শতাধিকবর্ষ পূর্বে সংশয়ী কিশোর মনে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল—নতুন ছন্দে এমন সুন্দর কবিতা কে আর লিখতে পারে সেযুগে—এটি নিশ্চয়ই বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক আলোচনা [১৮] এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

রচনার নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হোলো—

দম্ভ

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ। তাল একতালা।
আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয়।
তমোগুণে তমোরূপী মম সম নয় ॥

১৮। "বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভূত কৌতুক নাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানাঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দামনৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ওকথা আর বোলো না…
…….হাসবে লোকে।—

এতবড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই; কিন্তু একসময়ে জানিতে পাইব, এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।"—জীবনস্মৃতি, বাড়ির আবহাওয়া, পৃষ্ঠা ৫৭, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উদ্ধৃত গানের লাইনগুলি প্রমাণ করে রচনাটি গুপ্ত কবির বোধেন্দুবিকাস নাটকের যা রবীন্দ্রনাথ ভুলক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে করেছিলেন।

সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অতি খর্ব্ব,
তুচ্ছ বিধি, হরি সর্ব্ব, আমি সর্ব্বময় ॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিল ভুলে,
লঘু হয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয় ॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হ। আমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে।

সাক্ষাৎ জগদীশ্বর মহারাজ মহামোহ এইমাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন,—

"হে প্রাণাধিক দম্ভ! বাপু তোমার কুশল হোক্, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা-বিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমারদিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শমদম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর ২ মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারানসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, কামাক্ষ্যা, চন্দ্রনাথ এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি সকলতীর্থ গমন ও ভ্রমণপূর্ব্বক শত্রুদিগের সংহার কর। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমিগণের আশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্মে বিষমতর বেদনা প্রদান কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়"। আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশীবাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে।"

এরপর চপলাপতি, মালিনী ও চৌপদী ছন্দে কবিতায় এবং পরে সাধু গদ্যে দম্ভের আত্মপ্রচার ব্যক্ত হয়েছে। উপরোদ্ধৃত গদ্য-সংলাপ অনুপ্রাসের অস্বস্তিকর ব্যবহার ['গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল' ইত্যাদি] গুপ্ত কবির কবি-স্বভাবের ব্যঞ্জনাস্বরূপ।

উপরোদ্ধৃত অংশের কিছু পরে ["দূর থেকে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক"] দম্ভের উক্তি হোলো :—

"গঙ্গার ওপার হোতে এপারে ঐ'কে আস্‌ছে ;
গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্ ভাস্‌ছে।
সকলকে তুচ্ছ জ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষ্‌ছে ;
বাহু নেড়ে ধরা যেন শাস্‌ছে ;
ঐ যে দেখি ভণ্ড-দলের ভণ্ডামি সব্ নাশ্‌ছে ;
নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্‌ছে ;
হাদে, ঐ কে আস্‌ছে ; কে আস্‌ছে ;

বোধহয়, ইনি দক্ষিণ রাঢ় দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, ইঁহারি নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।"

—উদ্ধৃত কবিতাংশে গুপ্ত-কবির শব্দ-চয়ন ও জাদুকরী ছন্দ বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ঈশ্বরগুপ্তের ছন্দজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন [ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৩] :—

"মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র, রামপ্রসাদের চেয়ে কিছু বেশি ছন্দ সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বোধের চেয়ে জ্ঞান বেশি ছিল। কিন্তু সে জ্ঞান সুগভীর ছিল না, ফলে ছন্দের মূলনীতিগুলি তাঁর কাছে অনাবিষ্কৃতই ছিল। এবিষয়ে তিনি প্রধানতঃ চলতি ধারণার দ্বারাই চালিত হতেন। অথচ তাঁর ছন্দের বোধ ছিল সুপ্রখর। তাই যখন তিনি শুধু বোধের দ্বারা চালিত হতেন তখনই তাঁর ছন্দে দেখা দিত সুষমা ও মাধুর্য। কিন্তু যেই তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন অমনি ছন্দ বাঁধা পথে চলতে শুরু করত। তাঁর রচনায় যা কিছু অভিনবত্ব তার অধিকাংশই চলতি প্রথার গণ্ডির মধ্যে এবং ছন্দোবন্ধ রচনায় অর্থাৎ ছন্দের বহিরাকৃতিতে, অন্তঃপ্রকৃতিতে নয়। এটা তাঁর সচেতন মনের খেলা। ছন্দের বোধ বাসা বেঁধেছিল তাঁর কানে, জ্ঞানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেনি।····· এই কারণে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কলাবৃত্ত ছন্দরচনার বেলায়। কান ও জ্ঞানের বিরোধঘটিত এই যে ট্র্যাজেডি, তার দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঈশ্বরচন্দ্রের বোধেন্দুবিকাস নাটক থেকে। এই নাটকের মঙ্গলাচরণ' অংশেই আছে—

শিশির, 'বসন্ত', নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এসব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার।

ছন্দ-জগতের দুষ্ট-সরস্বতী স্পষ্টতঃই এখানে অক্ষরসংখ্যার সমতা দেখিয়ে কবিকে ভুলপথে চালিয়েছেন। নতুবা 'বসন্তে'র আগে কিছুতেই 'শিশির' আসতে পারত না, আসত 'শীত' বা অন্য কিছু। ছলনাময়ীর মায়াজাল বিস্তারের আর একটি দৃষ্টান্ত এই—

মরকতমণিমণ্ডলমণ্ডিত
মোহন মুকুট মুখ সুশোভিত
মথুরামহীপ মুকুন্দমাধব
মধুর মুরলী ধর হে।
... ...
পরমানন্দ প্রেম প্রসঙ্গ,
প্রমোদ পীযুষ পূরিত অঙ্গ,
পতিত পাবন প্রণত পালক,
পরমপুরুষ পরহে ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' [মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত], পঞ্চম অঙ্ক, পৃষ্ঠা ২৮

এটির প্রথম অংশে কবির সচেতন মন সযত্নে অক্ষর সংখ্যার সমতা রক্ষা করে চলেছে। এখানে কবির শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অতন্দ্র। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ রচনার কালে দেখি জ্ঞানের প্রহরী ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই তিনি কানের দ্বারা চালিত হয়ে অনায়াসেই ছন্দ-সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেন।

…কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ হচ্ছে মূলতঃ গীতিরচনার বাহন। চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দ কাব্য তার প্রমাণ। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিরাও এই ধারার অনুসরণ করেছেন।…ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক গান রচনা করেছেন, গাইতেও তিনি পারতেন, সুরতালের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাঁর। কিন্তু গানের ইতিহাসে গীতিকার বা সুরকার হিসাবে তাঁর কোন স্থানই নেই। রামপ্রসাদের মতো কানের উপলব্ধি ও গানের অনুভূতি তাঁর মজ্জাগত ছিল না। তাই গীতিরচনার মুখ্য বাহন কলাবৃত্তরীতির স্বরূপ তাঁর আয়ত্ত হয় নি।"

বোধেন্দুবিকাস নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে কোন উল্লেখ নেই তবে পূর্বে বর্ণিত 'জীবনস্মৃতি'র বক্তব্য থেকে একথা অনুমান করা বোধহয় অসমীচীন নয় যে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে ঠাকুরবাড়ীতে এ নাটকের অভিনয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, কিম্বা অন্তত সে সম্বন্ধে সচেষ্ট উদ্যোগ আয়োজন হয়েছিল।[১৯]

প্রসঙ্গত একটী বিষয়ের আলোচনা এখানে অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে উনিশের শতকের প্রথম ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত একশত-বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাব অপরিসীম। বিশেষত ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সার্বিক অনুকূল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার ওপর এ নাটকের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃতচর্চা গতানুগতিকভাবে করেন নি। সংস্কৃত ভাষার রসসম্পদ আহরণ করবার স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর ছিল। সাম্প্রতিককালে রচিত একটি প্রবন্ধে শ্রীভবতোষ দত্ত বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনায় বোধেন্দুবিকাস এবং মূল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।[২০] 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু এর রচনা ১৮৭৩-র পূর্বেই সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে স্বপ্নদর্শনের তিনটি সংস্করণ [১৮৭৫, ১৮৯৪, ১৯১৪] প্রকাশিত হয় এবং

১৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' [১৩২৬], পৃষ্ঠা ৭১ দ্রষ্টব্য।

২০। দ্রষ্টব্য :—কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভবতোষ দত্ত, 'এক্ষণ' পত্রিকা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৯-৩৮

শ্রীভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করে 'এক্ষণ' পত্রিকার পরবর্তী একটি সংখ্যায় [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২] শ্রীনীলরতন সেন পুনরায় বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথের ছন্দ সচেতনতা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সংস্করণের প্রতিবারেই যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ পরিবর্তিত হয়।[২১] শ্রীভবতোষ দত্ত তাঁর আলোচনা প্রবন্ধে বলেছেন :—

"ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্দুবিকাস নানা কারণেই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। এর ভাষা ছন্দ দুইই সেকালের পক্ষে অসামান্য ছিল। এই দুই দিক দিয়েই বোধেন্দুবিকাস দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার মূলে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়।… তাই, আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের মূলে প্রত্যক্ষ প্রভাব যদি কোন কিছুর থেকে থাকে তবে ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্দুবিকাস এবং সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাবই ছিল। কিন্তু বোধেন্দুবিকাস থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছন্দসচেতনতা ও ভাষা সচেতনতা লাভ করে থাকলেও মূল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বারাই তিনি বক্তব্য বিস্তারে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন।"

অবশ্য স্বপ্নপ্রয়াণ রচনায় জগদ্বিখ্যাত দুখানি গ্রন্থের প্রভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন।[২২]

২১। দ্রষ্টব্য:—জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৫৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২২। বাংলা সাহিত্যে রূপকের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীভবতোষ দত্ত উপরোক্ত প্রবন্ধে—,

প্রিয়নাথ সেন—প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' [সম্ভবত ১৯১৫তে লিখিত] প্রবন্ধে—, ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'নবীন কবিতার সূত্রপাত' অধ্যায়ে, কানাই সামন্ত 'দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ, [বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২], প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার কবি' [১৩৬৬], বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শনের [পৌষ, ১২৭৯] এক সমালোচনা প্রবন্ধে।

উপরোক্ত আলোচনা নিবন্ধ এবং শ্রীভবতোষ দত্তের 'কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে জানা যায় উনিশের শতকের বিভিন্ন রূপকাশ্রয়ী কাব্য রচনায় 'ফেয়ারী কুইন', 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্' ও 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রভাব সবিশেষ। উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হোলো :—

ক। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ' [১৮৬৮], খ। বলদেব পালিতের রচিত প্রথম কাব্য 'কাব্য মঞ্জরী'র [১৮৬৮] অনেকগুলি কবিতা, গ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবনোদ্যান' রূপক কাব্য [১৮৬৮], ঘ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি রূপক কাব্য 'আশাকানন' [১৮৭৬] ও 'ছায়াময়ী' [১৮৮০]।

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শ্মশান দৃশ্যটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কাপালিকের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'ও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

একটি কবি স্পেন্‌সার কর্তৃক পদ্যে লিখিত 'ফেয়ারী কুইন' অপরটি বানিয়ান কর্তৃক গদ্যে লিখিত 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্'। তাই তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত বলেছেন :—

"স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্থূল কাহিনীর [প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কাহিনীর মূল কেন্দ্র হচ্ছে যুদ্ধ। তারি সঙ্গে শান্তি ও করুণার শ্রদ্ধার জন্য ব্যাকুল সন্ধান] দিক দিয়ে এর খুব মিল নেই। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রোদয়ে বিশেষত তার অনুবাদে নানাবিচিত্র রসের অবতারণা সুন্দর উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে।... পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসের 'দি প্যালেস বিউটিফুল,' 'দি ভ্যালি অফ হিউমিলিয়েশন,' 'দি সেলেশিয়াল সিটি' প্রভৃতি নামগুলি স্বপ্নপ্রয়াণের নন্দনপুর, বিষাদপুর, বিলাসপুর প্রভৃতি নামকরণরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তথাপি পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্ স্বপ্নপ্রয়াণের কবিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল, একথা জোর করে বলা যায় কিনা সন্দেহ। য়ুরোপে এবং এদেশেও স্বাভাবিকভাবেই মধ্যযুগে রূপকরীতির উদ্ভব হয়েছিল। তাই দুয়ের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে মিল থাকাও আশ্চর্যের নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্তুত প্রথাকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের কতকগুলি মিলও দেখানো যায়। পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেসের প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা স্বপ্নপ্রয়াণে নেই—এর ঘটনা চরিত্র এবং পরিস্থিতির বিচিত্রতা উৎসুক কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এই মিশ্ররসই রসের প্রচ্ছন্ন অখণ্ডতা সত্ত্বেও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতো স্বপ্নপ্রয়াণেরও বিশেষত্ব। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতোই এখানেও রাজা রাজসভা এবং পার্শ্বচরদের ভূমিকা। বিবেক এবং মহামোহ দুই প্রতিপক্ষ রাজা, এখানে নন্দনপুররাজ আনন্দভূপ এবং বিষাদপুর-রাজ হাহা হূহু গন্ধর্ব। আনন্দভূপের পক্ষে বীররস এবং গন্ধর্বরাজের পক্ষে রসাতলপতি ভয়ানক রসের যুদ্ধও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বারাণসী ক্ষেত্রে বিবেক এবং মহামোহের সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধের অনুরূপ। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চম সর্গ রসাতল-প্রয়াণ তুলনীয়। প্রথমোক্ত নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে তান্ত্রিক বৌদ্ধ কাপালিক জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমতের রূপক চরিত্রগুলির সমাবেশে কথোপকথনে এবং স্থূলতায় যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্নপ্রয়াণের পঞ্চমসর্গে আধিব্যাধি, ভয়ানক রস, কাপালিক ইত্যাদি চরিত্রের সমাবেশে সেইরকম নাটকীয়তাই সূচিত।...দুই কাহিনীর উপসংহারেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি, শান্তি এবং করুণার জয়। স্বপ্নপ্রয়াণে কবি কল্পনাকে ফিরে পেয়েছেন, নন্দনপুরে ফিরে এসেছেন, ভয়ানক রস নিহত। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে মহামোহ পরাভূত, সৈন্যদল নিহত, করুণা ও শান্তি বিষ্ণুভক্তির কাছে ফিরে এসেছে, বিবেকের প্রবোধোদয়।"

—এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলা অন্যায় হবে।

বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন রচিত।— ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :—

প্রবোধচন্দ্রোদয়। কাব্য কৌমুদী এবং কৃষ্ণকেলি প্রণেতা কাদিহাটী নিবাসি ৺বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন প্রণীত কলিকাতা জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। কলুটোলায় নম্বর ৬৭ এমামবাড়ী লেন, বেন্‌টিং স্ট্রীট। শকাব্দা ১৭৯৩। একটাকা মাত্র।

আখ্যা-পত্র থেকে এবং ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের [দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ] ৪৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট থেকে জানা যায় বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন দুখানি কবিতার বই রচনা করেন—‘কাব্য কৌমুদী’ ও ‘কৃষ্ণকেলিকল্পলতা’।

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় ‘বিজ্ঞাপন’-এ গ্রন্থপ্রাপ্তির স্থান নির্দেশ করে বলা হয়েছে—

“এই পুস্তক মোং হাওড়া শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিসপেন্সরিতে এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নম্বর ৬৭, জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেসে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার ইচ্ছা হয় উক্ত স্থানে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।”

গ্রন্থখানি ‘শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি. এ. মহাশয় সমীপেষু,—সানুনয় নিবেদন’ সহ উৎসর্গ করে অনুবাদকের দুই পুত্র অনুবাদক ও তাঁর অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন :—

“আমাদিগের পিতা ৺বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিত, সুপ্রসিদ্ধ, সংস্কৃত নাটক দৃষ্টে সন ১২৪৬ সালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হয়েন, এজন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় ইহা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সকল বিষয়ে সুযোগ না হওয়ায় আমরাও এই ৩১ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে ইহা মুদ্রিত করিয়া, বহুগুণবিশিষ্ট কোন উপযুক্ত ব্যক্তির করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হওয়ায় এই গ্রন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। প্রবোধচন্দ্রের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার সময় প্রুফ সংশোধন বিষয়ে আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এতএব ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা তজ্জন্য আপনার নিকট বিশিষ্টরূপে বাধিত রহিলাম। বশম্বদ শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া ১লা আষাঢ় ১২৭৮ সাল।”

উৎসর্গ পত্রের পরপৃষ্ঠায় বাংলা পয়ারছন্দে ছয়পৃষ্ঠা ব্যাপী ‘প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ’ লিপিবদ্ধ আছে। ষষ্ঠ অঙ্কে ১২৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। ধ্রুবপদগুলি কবিতায় এবং সংলাপগুলি গদ্যে লিখিত হয়েছে। এছাড়া মাঝে মাঝে গানও আছে। নট-নটী, মঙ্গলাচরণ ইত্যাদি সহ নান্দীপাঠের পর প্রথম অঙ্কের নাটকীয় ঘটনা সুরু হয়েছে যথাযথভাবে। দৃশ্যবিভাগ থাকলেও দৃশ্যাঙ্ক বর্ণিত হয় নি।

মূল সংস্কৃত নাটক এবং আত্মতত্ত্বকৌমুদীতে ছটি অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে—

১। বিবেকোদ্যম ২। মহামোহোদ্যোগ ৩। পাষণ্ডবিড়ম্বন ৪। বিবেকোদ্যোগ ৫। বৈরাগ্যোৎপত্তি ৬। প্রবোধোৎপত্তি। আলোচ্য অনুবাদকর্মে অঙ্কগুলির নামকরণ নিম্নরূপঃ—

১। রঙ্গভূমি মানবপ্রকৃতি—সংসারাবতার নামক প্রথমাঙ্ক।

২। রঙ্গভূমি বারাণসী— —

৩। রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান—পাষণ্ডবিড়ম্বন নামক তৃতীয়াঙ্ক।

৪। রঙ্গভূমি তীর্থস্থান—বিবেকোদ্যোগ নাম চতুর্থাঙ্ক।

৫। রঙ্গভূমি বারাণসী চক্রতীর্থ—বৈরাগ্য সমাগম নামক পঞ্চমাঙ্ক।

৬। রঙ্গভূমি বারাণসী—জীবন্মুক্তি নামক ষষ্ঠাঙ্ক।

আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন[২৩] :—

"ঠিক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেখা না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই ঊনবিংশ শতাব্দের মাঝের দিকে বাঙ্গালায় নাটক-ছাঁদের রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনুদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকই এই ধরণের প্রথম লেখা [রচনাকাল ১২৪৬ সাল, প্রকাশ ১৮৭১]। বিশ্বনাথের অনুবাদে নাটকের প্রাচীন ঠাটবজায় আছে। আরম্ভে পয়ারে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে। শ্লোকগুলির পদ্য অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগত। সংলাপের গদ্য অংশের ভাষা প্রাচীন ধরণের হইলেও উৎকট নয়। তোটকছন্দে একটী গান এবং জয়দেবের ছন্দে একটী স্তোত্র আছে।"

গ্রন্থের প্রারম্ভে 'এই নাটকে পরমাত্মার বংশাবলি যেরূপ কল্পিত হইয়াছে তাহার বিবরণ' [প্রবৃত্তি পক্ষ ও নিবৃত্তি পক্ষ সহ] এবং 'নাট্যালিখিত ব্যক্তিগণের নাম' [পুরুষ ও স্ত্রী] উল্লিখিত হয়েছে।

এবার অনুবাদের নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ [রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান শান্তি ও করুণার প্রবেশ] উদ্ধৃত করা যাক :—

শান্তি [সজলনয়নে, সকাতরে] হায়! আমি মাতৃবিচ্ছেদে কাতরা হইয়াছি, এক্ষণে কোথায় গিয়া মনের তাপ নিবারণ করিব। ওগো মাতা শ্রদ্ধা! তুমি কোথায় আছ, 'একবার দেখা দেও। হায়! আমি এখন কোথায় যাই,' কোথা গেলে জননীর সাক্ষাৎ পাইব।

মুনির আশ্রম গিরি, গয়া গঙ্গা গোদাবরী,
বারাণসী বৃন্দাবন ধাম।
আমারে লইয়া সঙ্গে, থাকিতে পরমরঙ্গে,
সর্ব্বদা শুনিতে রাম নাম॥

২৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪।

আজ সেই শ্রদ্ধা তুমি, গিয়াছ পাষণ্ডভূমি,
যবনের গৃহে যেন ধেনু।
না জানি আছ ক্যামনে, ক্যামনে বাঁচ জীবনে,
কি প্রকারে রক্ষা পায় তনু ॥

সখি করুণা! আমি বোধ করি আমার জননী শ্রদ্ধা, আমার বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতু,

আমায় না দেখে শ্রদ্ধা স্নান নাহি করে।
না করে ভোজন আর নাহি রহে ঘরে ॥
আমার বিচ্ছেদে শ্রদ্ধা মরেছে নিশ্চয়।
কিম্বা পাষণ্ডের হাতে জীবন সংশয় ॥

এক্ষণে শ্রদ্ধার ব্যতিরেকে শান্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র! প্রিয়সখি! তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে শ্রদ্ধার সহচারিণী হইব।

—অনুদিত গদ্য ও পদ্যাংশের [ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত] সহজতা, স্বাভাবিকতা ও নাটকীয়তা লক্ষণীয়।

এ নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না।

আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'

গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিম্নরূপ :—

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকম্। শ্রীআদ্যানাথ বিদ্যাভূষণ কৃতানুবাদসমেতম্ শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দত্তেন প্রকাশিতম্। কলিকাতা রাজধান্যাং ৩৩ সংখ্যক নূতন চিনাবাজারস্থ যন্ত্রে শ্রীরাধিকাচরণ দাসেন মুদ্রিতম্। সন ১৩০০ সাল। মূল্য ১।।০ টাকা।

আখ্যা-পত্রের পরপৃষ্ঠায় 'পরদুঃখবিধুর পরোপকারব্রতনিরত প্রশান্তচেতাঃ প্রভৃত মার্জিত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পরম পূজ্যপাদ সার্থকনামা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু সবিনয়নিবেদনমিদং'—বলে গ্রন্থখানি 'একান্ত অনুগত' হিসাবে শ্রী গোপালচন্দ্র দাস দত্ত উৎসর্গ করেছেন শিবপুর ৩৬নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেন থেকে।

"এই পুস্তক ৩৬নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন শিবপুর হাওড়া, ও ৪নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্ কলিকাতা, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস দত্তের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ১।।০ দেড় টাকা"—গ্রন্থের শেষে একথা কয়টি মুদ্রিত আছে।

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের বিজ্ঞাপন-এ বলেছেন :

"সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকার এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি রচনা করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য বৈচক্ষণ্য ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভাবসকল সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহা অতিশয় দুরূহ ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। টিকার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের অধ্যাপনা ও অধ্যাপক মহাশয়দিগের অনায়াস সাধ্য নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার টীকাকর্ত্তা ও তাদৃশ পটু নহেন। বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশ না করিলে টীকার ভাবার্থসকল বুঝা যায় না। এই সকল কারণে এতাদৃশ আদরণীয় গ্রন্থের তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্যের সহিত সাধারণের পরিচয় নাই। সাধারণকে ইহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে দুই তিনজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত এই নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা দেখিয়া আমার ভূতপূর্ব্ব প্রিয়তম ছাত্র ও পরমহিতৈষী প্রতিবেশী শ্রী গোপালচন্দ্র দাস দত্ত এই নাটকখানির সমূল সরল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেইহেতু আমি অনুবাদকার্য্য নির্বাহের নিমিত্ত তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ ও অর্পিত ভার হইয়া এই নাটকের সরলভাষায় বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। মূলের সহিত অনুবাদের মিলন রাখিবার নিমিত্ত ও প্রকৃতভাব সাধারণের নিকট প্রকাশ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই অনুবাদ কোনও অংশে মূলাংশের তাৎপর্য্যবোধের সাধক ও পাঠক মহাশয়গণের হৃদয়গ্রাহী হইলে আমরা উভয়ে [অনুবাদক ও প্রকাশক] আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব এবং আমাদিগের সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইবে। শ্রী আদ্যানাথ শর্ম্মা শিবপুর সন ৩০০ সাল ২০শে পৌষ।"

ষষ্ঠ অঙ্কে নাটক সমাপ্ত। ছয় অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১। মানবপ্রকৃতি ২। বারাণসী ৩। বারাণসী সন্নিধান ৪। তীর্থস্থান ৫। বারাণসী চক্রতীর্থ ৬। বারাণসী।

গ্রন্থের প্রথমে মূল সংস্কৃত নাটকটি [সম্পূর্ণ] বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে এবং তারপর ৮১ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। অনুবাদকর্ম্ম মোটামুটিভাবে যথাযথ হলেও স্থানে স্থানে সংক্ষেপিত। এবার যথাযথ অনুবাদের নমুনাস্বরূপ নান্দী অংশের সূত্রধারের উক্তি দু'নম্বর শ্লোকটির ['অন্তর্নাড়ী নিয়মিত······চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ'] বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা যাক :—

—যাহা চন্দ্রার্দ্ধমৌলির ধ্যানাবস্থায় তাঁহার শরীরাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না—নাড়ীতে নিয়মিত বায়ুদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গামী, যাহা শান্তিগুণবিশিষ্ট মহেশ্বরের চিত্তে ধ্যানবশতঃ জায়মান পরমানন্দে সতত পরিব্যাপ্ত এবং যাহা পরমযোগী সদানন্দের ললাটনেত্ররূপে সুস্পষ্ট ব্যক্তীভূত, সেই জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ, তাঁহাকে প্রণাম।

—সাধুগদ্যে রচিত উপরোক্ত অনুবাদে সূত্রধারের মঙ্গলাচরণের স্বাভাবিক নাটকীয়তা কিছুটা হানি ঘটিয়েছে।

কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদের নমুনা স্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ [তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভ—রঙ্গভূমি বারাণসী সন্নিধান—শান্তি ও করুণার প্রবেশ। সংস্কৃত নাটকের 'ততঃ প্রবিশতি শান্তিঃ করুণাচ থেকে মুক্তাতঙ্ক……ক্ষণার্দ্ধমপি জীবতি' ইত্যাদি শ্লোকের পর 'তদবিনা শ্রদ্ধয়া……সহচরী ভবামী' গদ্যাংশ পর্য্যন্ত] এখানে উদ্ধৃত করা হোলো :—

শান্তি। [সজল নয়নে] ওগো মা! মাগো! তুমি কোথায় আছ, আমাকে প্রত্যুত্তর দাও। হে মাতঃ শ্রদ্ধে। তুমি সিদ্ধাশ্রমে, পর্ব্বতশ্রেণীতে, পুণ্য দেবালয়ে ও অবিশ্রান্ত তপোনিষ্ঠ বৈখানস সমীপে থাকিয়া প্রীতিলাভ করিতে; হায়! হায়! এখন চণ্ডাল গৃহাগত কপিলাগাভীর ন্যায় পাষণ্ড হস্তগত হইয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতেছ! অথবা যখন তুমি আমাকে দেখিতে না পাইলে স্নান কর না, আহার কর না, নিদ্রা যাও না, অধিক কি, আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পার না, তখন তোমার জীবনের আশা করা বৃথা। অতএব শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে শান্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সখি করুণে! তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি অবিলম্বে সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া মাতা শ্রদ্ধার সহচারিণী হই।

—অনুবাদকর্ম সহজ এবং স্বাভাবিক হওয়ায় সংলাপের নাটকীয়তা মোটামুটিভাবে বজায় আছে। তবে, অনুবাদকর্মে যে স্থানে স্থানে পরিবর্জন ও পরিমার্জন [মূল থেকে] সাধিত হয়েছে তা বোঝা যায় পূর্ববর্তী অনুবাদক বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন কৃত গ্রন্থের আলোচ্য অংশের অনুবাদ কর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৯-১৯২৫] অনূদিত আলোচ্য গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ২৪শে মার্চ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে [১৩০৮ সাল]। পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীতে নাটকটি স্থানলাভ করে। আরও পরে [১৩৩৮] কলকাতার সান্যাল এণ্ড কোং এ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন।

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বা বসুমতী সংস্করণের [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী] গ্রন্থে অনুবাদকের কোন 'ভূমিকা' 'বিজ্ঞাপন' বা অবতরণিকা জাতীয় কোন কিছু লিপিবদ্ধ হয়নি—সান্যাল কোং প্রকাশিত গ্রন্থেও তেমন কিছু নেই। ফলে অনুবাদের রীতি বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিতভাবে কোন কিছু জানা যায় না। তবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য অনুবাদের ন্যায় আলোচ্য অনুবাদকর্মও যথাযথ এবং মূলানুযায়ী—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নমুনাস্বরূপ নান্দীর ছ'নম্বর শ্লোকটির ['অন্তর্নাড়ী…চন্দ্রার্দ্ধ মৌলেঃ'] বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যাক :—

অন্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ুযোগে যাহা উঠে
ব্রহ্ম রন্ধ্র করি অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্মা মাঝে প্রগাঢ়-আনন্দরূপে
সহসা যা হয় উন্মীলন,
অর্দ্ধেন্দু-শেখর সেই যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে
নেত্ররূপে যাহার উদয়,
সেই সে জগদ-ব্যাপী অন্তরস্থ-জ্ঞান-জ্যোতি
—হউক তাহার জয় জয়।

দ্বিতীয় নমুনাস্বরূপ তৃতীয়াঙ্কের প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদই উদ্ধৃত করা হোলো :—
শান্তি। [সাশ্রুনয়নে]-মাগো ! মাগো—কোথায় তুমি, উত্তর দেও।

কুরঙ্গ আতঙ্কহীন
যে কাননে সতত বিচরে
যে সকল শৈল হতে
নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,
পুণ্যালয়-যেথা থাকে
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু-যতি
সেই সব স্থান তব
ছিল যে গো সাধের বসতি;
—হায় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত
কপিলা গাভীটির মত
কেমন করিবে মাগো জীবনধারণ বল
পাষণ্ডের হয়ে হস্তগত

অথবা হায়! তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা কেননা :—
মোরে না দেখিয়া যেগো না করে আহার স্নান
না করে শয়ন,
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না করিবে ক্ষণমাত্র
জীবনধারণ।

—অনুবাদ কর্ম, যথাযথ, সহজ, স্বাভাবিক ও নাটকীয় ব্যঞ্জনা ধর্মী। প্রসঙ্গত, বলাবাহুল্য যে তুলনামূলক বিচারে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সমস্ত অনুবাদকর্মের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদালাভের যোগ্য।

দুঃখের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত গ্রন্থটি কখনও কোথাও অভিনীত হয় নি। আরও দুঃখের বিষয়, যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রায় একশোবছর ধরে বিভিন্ন মৌলিক রচনায় প্রেরণাস্বরূপ হোলো তার একটি বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থেরও কোন অভিনয়ানুষ্ঠান কোথাও সম্পন্ন হয়নি [বোধেন্দুবিকাশের অভিনয়ানুষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট সংবাদ কোথাও পাওয়া যায়নি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে অভিনয়ের জন্য মহড়ার উল্লেখ আছে]।

অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তীর 'গঙ্গামঙ্গল'

প্রণব রায়

মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদাপরগণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তীর নাম সাহিত্যের ইতিহাসে আজও বিশেষ পরিচিত নয়। সম্প্রতি এই কবির মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটাল অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে[১]। (কবি অকিঞ্চন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকের কবি রামেশ্বরের সমসাময়িক ও দেশবাসী ছিলেন। তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গলে'র একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন ১৩৬০ সালে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র (৬০ বর্ষ) প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যটির আলোচনা আজ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে অকিঞ্চনের এই কাব্যটি আজও অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত থাকিলেও অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে রচিত এই কাব্যটির আলোচনা অপরিহার্য্য।

অকিঞ্চন চক্রবর্ত্তী অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে সপ্তম দশক পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গল' পুঁথিতে যে রচনাকালের উল্লেখ আছে তাহাতে জানা যায় কবি এই কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানটি ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন[২]। সদাগর উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছিল ১৬৫১ শকাব্দ বা ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে।[৩] গঙ্গামঙ্গল কাব্যটি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ইহা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে বাঙলা ১১৮৩ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল।

অকিঞ্চনের গঙ্গামঙ্গল পুঁথির পত্রসংখ্যা মাত্র উনিশ। পত্রগুলি তুলটকাগজের। উহাদের কোন কোনটি দোভাঁজপত্রে লিখিত। পুঁথিটির দুইটি অংশ আছে। প্রথমটিকে পূর্বাংশ ও

১) "কবির দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদের বর্তমান বংশধরগণ বর্ত্তমানে ঘাঁটাল মহকুমার বেঙ্গরালগ্রামে বাস করেন। পুঁথিগুলির জন্য লেখক শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তীর নিকট কৃতজ্ঞ।

২) বামে বিধু কলাপূর্ণ বেদে বিধু (?) রয়।
মিথুনে মিহিরস্থিতি দিনে মুনিত্রয় ॥
শঙ্করীর সঙ্গীত সে শকে হৈল্য সারা।"
[বিধুকলাপূর্ণ—১৬ বেদ—৪ বিধু—১—১৬৪১ আবার বিধু—১ কলাপূর্ণ—১৬ বেদেবিধু—৫ বা ১১৬৫ সাল ধরিলে কষ্টকল্পনা হয়]

৩) বাণে বিধু বিরাজে বামেতে বিধুকলা
শরৎ সুধন্যা কর্য়া কণ্ঠে রত্নমালা ॥
শঙ্করীর সঙ্গীত সে শকে হৈল্য সারা।"
[বাণ—৫ বিধু—১ বিধুকলা—১৬ —১৬৫১ আবার বিধু—১ কলা—১৬ বাণেবিধু—৬ বা ১১৬৬ সাল ধরলে কষ্টকল্পনা হয়]

দ্বিতীয়টিকে উত্তরাংশ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বাংশে দশটি ও উত্তরাংশে নয়টি পত্র আছে, পত্রগুলির প্রত্যেকটি দুই পৃষ্ঠায় লিখিত। কয়েকটি দোভাঁজ পত্রও আছে। দোভাঁজ পত্রগুলির ভিতরের দিকে কোন লেখা নাই। পূর্ব্বাংশ ও উত্তরাংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত। প্রতি অংশের শেষভাগে প্রহেলিকার মাধ্যমে কবি রচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বাংশের রচনাকাল বাঙলা ১৮৮১ সালের ৭ই চৈত্র। প্রহেলিকাটি নিম্নরূপ—

"বসুতে বিরাজে বিধু বামে বাণেশ্বর।
মীনেতে মিহির মহোদধি যে বাসর ॥
পুরাণ প্রসঙ্গ পুণ্যদিনে হৈল সারা।
পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিযুষের ধারা ॥" (পূর্ব্বাংশ পত্র ১০ পৃঃ ২)

উদ্ধৃত অংশটির অর্থ এইরূপ : বসু=৮ বিধু=১। বসুতে বিধু বিরাজ করিলে ৮ হয়। তাহার বামে 'বাণেশ্বর' অর্থাৎ 'বাণেশ্বরে'র অর্থ 'রুদ্র' ধরিলে ১১ হয়। এইভাবে ১১৮১ সাল বা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বাংশটির রচনাকাল বুঝা যায়। প্রহেলিকায় শকের উল্লেখ না থাকায় বঙ্গাব্দ বুঝিতে হইবে। মীনেতে মিহির=চৈত্রমাস, মহোদধি=৭। তাহা হইলে তারিখ দাঁড়ায় ৭ই চৈত্র, ১১৮১ সাল। উত্তরাংশের রচনাকাল কবি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অংশটির নবম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কাব্যসমাপ্তি করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

সুরধনী সঙ্গীতা সুধার সমা ধারা।
তারিণীর মঙ্গল তিরাশি সালে সারা ॥
আষাঢ়ের একুশা অহর অবসানে।
অকিঞ্চন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ রস ভণে ॥"

ইহা হইতে জানা যায় কবি ১১৮৩ সালের ২১শে আষাঢ় দিবাবসানে কাব্যটির এই অংশের রচনা সমাপ্ত করেন। সমগ্র কাব্যটি বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। পুঁথির মধ্যে তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ আছে। কবি তেজশ্চন্দ্রের প্রশস্তিতে বলিয়াছেন—

"মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমানে যেন ইন্দ্র
পৃথিবীপালনে যুধিষ্ঠির।
প্রতাপে প্রচণ্ড রবি সভাতে পণ্ডিত কবি
ক্ষেত্রিয়নন্দন রণধীর ॥
নিবাস তাঁহার দেশে গঙ্গার মঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ সুবিদ্বান্।" (উত্তরাংশ পত্র ৮পৃঃ ১)

তেজশ্চন্দ্রের পিতা তিলকচন্দ্র ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তেজশ্চন্দ্র ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যভার পরিচালনা করেন। ইহার পর কিছুকাল শাসনকার্য্য তাঁহার জননীর হস্তে যায়। অকিঞ্চন তেজশ্চন্দ্রের

রাজ্যকালের প্রারম্ভেই 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তেজশ্চন্দ্র ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু কবি সম্ভবতঃ ইহার অনেক আগেই পরলোকগমন করেন। পুঁথির সহিত প্রাপ্ত প্রাচীন নথীপত্রের সাহায্যে ইহা অনুমান করা যায়।

"গঙ্গামঙ্গল" ও "চণ্ডীমঙ্গলে" কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় অকিঞ্চন বরদা পরগণার আটঘরা নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর (মিশ্র) পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল গঙ্গা দেবী ও পিতামহের নাম হরিহর আচার্য্য। কবি কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নাম ছিল গোবর্দ্ধন, তিন পুত্রের নাম রামদুলাল, রামচন্দ্র ও শিবানন্দ এবং এক কন্যার নাম ছিল পার্ব্বতী। নিম্নোদ্ধৃত ভনিতাসমূহে কবির আত্মপরিচয় জানা যায়:

(১) "বিপ্রকুলোৎপত্তি আটঘরাস্থিতি
ঠাকুর পুরুষোত্তম।
তাঁহার নন্দন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ
রচে কাব্য মনোরম।।" (চণ্ডীমঙ্গল)

(২) "শ্রীহরি মিশ্রির সুত রাধাকান্ত পদে রত
পুরুষোত্তম মিশ্রি ঠাকুর।
তাঁহার নন্দন কহে গঙ্গাপদ সরোরুহে
শ্রবণে পাতক যায় দূর।।" (গঙ্গামঙ্গল পত্র ১৬ পৃঃ ১)

(৩) "শ্রীমতী গঙ্গার সুত ব্রহ্মরূপপদে রত
রামনামে সদা কুতূহল।
চণ্ডিকা করিয়া ধ্যান দ্বিজ অকিঞ্চন গান
মনোহর নূতন মঙ্গল।।" (চণ্ডীমঙ্গল)

(৪) "পুণ্যবান্ কৃতকীর্ত্তি পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী
তাঁহার নন্দন গোবর্দ্ধন।
তাঁহার অনুজজন চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন
বিরচিলা চণ্ডীসঙ্কীর্ত্তন।।" (চণ্ডীমঙ্গল)

(৫) "শ্রীরামদুলালে রামচন্দ্রে শিবানন্দে।
কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদদ্বন্দ্বে।।" (গঙ্গামঙ্গল)

(৬) "কবীন্দ্র করিলা কাব্য কশ্যপের বংশ।।" (চণ্ডীমঙ্গল)

গঙ্গামঙ্গল পুঁথির প্রায় সব ভণিতায় অকিঞ্চন কবীন্দ্র উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নের ভণিতায় কবি নিজেকে 'কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

"চক্রপাণিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
রচিল্যা কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অকিঞ্চন।।"

এই উপাধিটি কবির যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কবির গুণমুগ্ধ তৎকালীন

ব্রাহ্মণসমাজ কবিকে যে এই উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন কবি সে বিষয় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"শ্রবণে সুখের ধাম কবীন্দ্র উপাধি নাম
রাখিলেন সমূহ ব্রাহ্মণ।" (চণ্ডীমঙ্গল)

মনে হয় 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনার পূর্ব্বেই কবি এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অকিঞ্চন 'গঙ্গামঙ্গলে'র পূর্ব্বাংশের নাম 'গঙ্গাবন্দনা'[৪] ও উত্তরাংশের নাম 'গঙ্গামঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিলেও ইহা মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা বা অংশে বিভক্ত। কিন্তু সমগ্র কাব্যটি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। পূর্ব্বাংশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তেরটি অংশে বিভক্ত। প্রধানতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বন করিয়া কবি এই অংশ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতপুরাণের আদিতে যেমন প্রায়শঃ শৌনকাদি মুনি প্রশ্নকর্তা ও সূত বক্তা সেইরূপ এই কাব্যেও পুরাণের এই রীতিটি অনুসৃত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

"শৌনকাদি সম্ভাষণে সূত তপোধন।
পতিদাতা গঙ্গার গুণের কথা কন॥
বর্ণিলেন ব্যাস ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে।
যে কথা জৈমিনি জিজ্ঞাসিল্যা দ্বৈপায়নে॥"

এই অংশের শেষে কবি আবার বলিয়াছেন—

"বলিবেন বাল্মীক বিস্তার রামায়ণে।
ভাগীরথী ভূতলে ভাসনা যে কারণে॥
ব্রহ্মবৈবর্তের মতে ব্রহ্মার প্রসঙ্গে।
সূতমুখে শৌনকাদি শুনিল সুরঙ্গে॥"

পূর্ব্বাংশের আরম্ভে দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে গঙ্গাবন্দনা ও উভয় অংশে বর্ণিত উপাখ্যানসমূহের অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। ইহার পর গঙ্গার উৎপত্তি, ব্রহ্মাকে মোহিনীর অভিশাপ ও অভিশাপ খণ্ডের জন্য শিবের গানে বিষ্ণুর দ্রবীভবন ও ব্রহ্মার শাপমুক্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে কাহিনী রচনা করিলেও কবি তাহাকে প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত ও নূতন করিয়া লইয়াছেন। মহোদধিমন্থনকালে সুধাকুম্ভ লইয়া দেব-দানবের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে বিষ্ণুর মোহিনীবেশে দৈত্যছলনা ও তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ এই অংশে নূতন বর্ণনীয় বিষয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের একত্রিংশ অধ্যায়ে মোহিনীর যে উপাখ্যান দেওয়া আছে সেখানে তাহাকে স্বর্গের নর্ত্তকীরূপে উল্লেখ কর

৪ গঙ্গাবন্দনার আরম্ভ নিম্নরূপ :

"অষ্টাঙ্গপ্রণতি হরী বন্দ গঙ্গা ব্রবময়ী
সুরেশ্বরী ত্রিলোকতারিণী।" ইত্যাদি (পূর্ব্বাংশ পত্র ১পৃঃ ১)

হইয়াছে। ব্রহ্মাকে দেখিয়া সে তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নানাভাবে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর অনুচরগণসহ ব্রহ্মার শিবকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন, শিবের গানে বিষ্ণুর দ্রবীভবন, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পবিত্র বারির কিয়দংশ স্বীয় কমণ্ডলুতে ধারণ ও পূত বারির সাহায্যে ব্রহ্মার অভিশাপমুক্তি ইত্যাদি কাহিনীর সহিত 'গঙ্গামঙ্গলে'র কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। কবি অকিঞ্চন এই কাব্যে ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং বিষ্ণুকে মোহিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মোহিনী উপাখ্যানের যে অংশটুকু অশ্লীলতা দোষদুষ্ট তাহা বর্জন করিয়াছেন। কবি বার বার তাঁহার কাব্যকে "সৎকাব্য," "সৎপ্রসঙ্গ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুণ্যপ্রসঙ্গবর্ণনাই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য। সূতমুখে কবি বলিয়াছেন—

শুন শুন শৌনকাদি সৎকথা।
শুনিলে শরীর শুদ্ধি সংসারে সর্ব্বথা॥"

যে কাব্যশ্রবণে শ্রোতার হৃদয় ও মনে পুণ্যভাব জাগ্রত হয় কবি সেই সৎকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ভাষা ও বিষয়গত গ্রাম্যতার লেশমাত্র নাই। তিনি একদিকে যেমন কাব্যকে সৎপ্রসঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়াছেন অন্যদিকে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে লৌকিক সহজ ভাবরসের সৃষ্টি করিয়া বর্ণনাত্মক, বৈচিত্র্যহীন ও অলৌকিক উপাখ্যান সমূহকে নবরূপ দান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট তাহা মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। এই কাব্যের উত্তরাংশটি পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'গঙ্গামঙ্গলে'র উত্তরাংশকে কবি 'সাগর প্রসঙ্গ' আখ্যা দিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

"সাগর প্রসঙ্গ কথা শুন সর্বজন।
যেইহেতু জম্বুদ্বীপে গঙ্গার গমন॥" (উত্তরাংশ, পত্র ১ পৃঃ ১)

প্রধানতঃ বাল্মীকি রামায়ণ ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবি এই অংশ রচনা করিলেও বিষয় বর্ণনা ও কোন কোন পৌরাণিক চরিত্রচিত্রণে কবির স্বাতন্ত্র্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অংশে সগররাজার উপাখ্যান, সগরবংশের বিবরণ ও ভগীরথের গঙ্গানয়ন বৃত্তান্তই প্রধান। কাহিনীগুলি সুপরিচিত। তথাপি এই সুপরিচিত ও বৈচিত্র্যহীন পৌরাণিক আখ্যানসমূহের অন্তর্গত কোন কোন চরিত্রচিত্রণে কবি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

নারদের চরিত্র ইহার দৃষ্টান্ত। একদিকে সগরকে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অপহরণ করিতে পরামর্শদান, অপরপক্ষে ইন্দ্রকে সগরের অশ্ব অপহরণ করিবার মন্ত্রপ্রদান—ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে এক উদ্দেশ্যহীন কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় কবি অকিঞ্চন তাহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রামেশ্বরও তাঁহার নারদকে শিবায়নে কৌতুকী কলহপ্রিয় সাধারণ মানবীয় চরিত্রের ন্যায় অঙ্কন করিয়াছেন। সেখানে নারদ—

"বীণাধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন।
কৌতুকী কলহপ্রিয় কার্য্যের কারণ
গুণবান্ পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষে ছাড়া॥"

কবীন্দ্র অকিঞ্চনও 'গঙ্গামঙ্গলে' নারদচরিত্রের কলহজাত কৌতুকপ্রিয়তা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। নারদ সগরকে বলিতেছেন—

"মুনি কন মহারাজা মন দিয়া শুন।
রঙ্গে ভুল্যা রাজা রাজধর্ম্ম ছাড় কেন॥
ইন্দ্র অধিকার লেহ অশ্বমেধ কর‍্যা।
কতকাল কষ্ট পায় নরমূর্তি ধর‍্যা॥" (উত্তরাংশ)

এদিকে ইন্দ্রের আলয়ে তাঁহাকে মন্ত্রণা দিতেছেন—

"তুষ্ট হয়্যা তপোধন তারে তত্ত্ব কন
শুন শচীপতি কিছু সুহৃদবচন॥
সুধাপানে সম্প্রতি স্বকার্য্য গেছ ভুল্যা।
জান নাঞি জ্বলন্ত আগুন আস্য জ্বল্যা॥
আরম্ভিল অশ্বমেধ ইন্দ্রত্বের আশে।
সগর স্বকার্য্য করে শক্র ডর কিসে॥
ইহার উপায় চেষ্টা অদ্য ইন্দ্র পায়।
হয় চুরি কর‍্যা আন হরি হয় যায়॥" ঐ

নারদের চরিত্রটি আরও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যখন তিনি সগরকে ইন্দ্রের অশ্বাপহরণের বিষয় জানাইয়া তাঁহাকেই আবার দোষারোপ করিতেছেন—

"তমোগুণে তুমি হে ঘটালে প্রতিজ্ঞা।
ঘোড়াচোরে বাঁধ্যা আন ঘটালে প্রতিজ্ঞা॥

এই কাব্যে কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পুরাণশাস্ত্র, অলঙ্কার ও সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় কাব্যের বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ছত্রে ছত্রে অনুপ্রাস রামেশ্বর ও ঘনরামের অনুপ্রাস স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি প্রায় সর্বপ্রকার অনুপ্রাসের সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুপ্রাস-সৃষ্টিতে তাঁহার কৃতিত্ব থাকিলেও এ বিষয়ে ঘনরাম ও রামেশ্বরের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়াছে মনে হয়। রামেশ্বরের কোন কোন সানুপ্রাস পংক্তি কবি এই কাব্যে সরাসরি গ্রহণ করিয়াছেন। রামেশ্বরের শিবায়নে পাই—"তার কথা ত্রিপুরারি ত্রিপুরারে কন।
প্রণমিয়া প্রধান পুরুষ পুরাতন॥"

অকিঞ্চনের 'গঙ্গামঙ্গলে' আছে—"তত্ত্বকথা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁ সভাকে কন।
প্রণমিয়া প্রধান পুরুষ পুরাতন॥"

অকিঞ্চনের এই কাব্যে বৃত্ত্যনুপ্রাসেরপ্রয়োগ বেশী দেখা যায়, যেমন—

"মাধবের মাহাত্ম্যে মহেশ মুগ্ধবান্।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন প্রভু গুণগান ৷৷"

ছেকানুপ্রাসের উদাহরণ, যথা—"পুত্রকন্যা রমণী অথবা অন্যজন।"
লাটানুপ্রাসের উদাহরণ, যথা—"মহামতী মহীর পালিনী মহীতলে" কিন্তু ইহাদের সংমিশ্রণেই কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—যেমন,

"পঞ্চমুখে পঞ্চানন প্রভু গুণগান।"

রামেশ্বরেও এই অনুপ্রাসত্রয়ের যুগপৎ প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন—

১) "কর্ম্মভূমে কুকর্ম্ম করিত নাহি কেহ" (শিবায়ন, বঙ্গবাসী সং পৃ-৮)

২) "বিশাই বসাইল শাল শিবের গোচরে" (,, , ,,)

—এই অংশে রামেশ্বরের বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস ও শ্রুত্যনুপ্রাসের সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অকিঞ্চনের 'গঙ্গামঙ্গলে' একইসঙ্গে অনুপ্রাসের সৌন্দর্য ও মাধুর্য্য পাঠককে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। যমকের সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে অকিঞ্চন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, যেমন—

১) "চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখ গান"।

২) "পঞ্চমুখে পঞ্চনাম পঞ্চানন গায়্যা"।

অকিঞ্চনের এই অনুপ্রাস প্রয়োগ বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন—

"অকিঞ্চন রামেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটি অন্ধ অনুকরণ করিয়াছিলেন...এই শব্দ বিন্যাসের কৃতিত্বের উপরেই ভারতচন্দ্রেরও প্রতিভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; তবে ভারতচন্দ্রের এবিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইহাদের তাহা ছিল না। ইঁহারা শব্দের দ্বারা কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্রের মত কলগুঞ্জন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।" (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ; ১৯৭০ পৃ ৫৪৯-৫৫৯)

অকিঞ্চনের এই অনুপ্রাসব্যবহার রামেশ্বরের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার 'গঙ্গামঙ্গলে'র প্রায় প্রতি ছত্রে যে অনুপ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে কাব্যের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে এই অনুপ্রাস ভাষার সৌকুমার্য্য আনয়ন করিয়াছে, যেমন—

১) "ত্রিভুবনতারিণী ত্রিধারা" (গঙ্গামঙ্গল)

২) "সর্ব্বপুরাণের সার শুন সর্ব্বজন।
ভজ ভজ ভাগীরথী ভুক্তির কারণ ॥" ইত্যাদি (গঙ্গামঙ্গল)

এইরূপে সহজ ও সুন্দর অনুপ্রাসের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত অকিঞ্চনের কাব্যে পাওয়া যাইবে। তাঁহার অনুপ্রাসে যে 'কোলাহল'ই আছে কলগুঞ্জন' নাই 'গঙ্গামঙ্গল' পাঠ করিলে তাহা কিছুতেই মনে হয় না। ভগীরথের মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন অংশে অনুপ্রাস ও শব্দের কলগুঞ্জন পাঠককে মুগ্ধ করে, যেমন—

"ব্রহ্মাপুর হৈতে চলিল গঙ্গা।
ত্রিলোকতারিণী কলুষভঙ্গা॥
তুঙ্গ তুঙ্গ অতি তরঙ্গ বারি।
সুখদাতা স্বর্গ-গমনকারী॥
তরল তরল তরঙ্গধারী।
পতিতপাবনী পাপাপহারী।" ইত্যাদি (গঙ্গামঙ্গল—উত্তরাংশ পত্র ১ পৃঃ ১-২)

'গঙ্গামঙ্গলে'র বহু স্থলে কাব্যের চমৎকারিত্ব ও কবির সুসংযত বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মোহিনীর রূপবর্ণনায় কবি এইরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"সুরাসুরে সুন্দরী সুন্দরী সমা নাঞি।
অঙ্গ তাঁর অনিন্দ্য নিন্দিতে নাঞি ধাঞি॥
……বদনবিমলবিধুবৃন্দ-মনোহর।
কদম্ব কোরককুচ উন্নত সুন্দর।
…কুন্দকলি দন্তগুলি সুপংক্তি সুন্দর।
মন্দ মন্দ মুখে হাসি মুনি মনোহর॥" (পূর্ব্বাংশ পত্র ৩ পৃঃ ২)

শৃঙ্গার ব্যতিরিক্ত অন্য রসসৃষ্টিতেও কবির কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মোহিনীর শাপে ব্রহ্মপুরের বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্যের বর্ণনায় কবি নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন—

"ব্রহ্মা চিন্তাকুল মোহিনী শাঁপে।
বিরস বদন সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে॥
…সমূহ দুর্গতি অন্তরে দেখে।
কালপেঁচা ঘন গিধিনী ডাকে॥
…চিৎকারধ্বনি পুরেতে উঠে।
শ্রীকাল শার্দ্দূল শব্দেতে ছুটে॥
উল্কাপাত হয় অনলবৃষ্টি।
ব্রহ্মপুরপ্রায় নিপাতসৃষ্টি॥
গড়্ গড়্ গিড়্ গিড়্ গগনে ডাক।
অলক্ষণ উঠে চিচ্‌কার বাক্॥" (পূর্ব্বাংশ ৫ম পত্র পৃ ২)

এই কাব্যের পূর্ব্বাংশের নবম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কবি শিবের গোবিন্দগুণগানে সুন্দর শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন—

"প্রেমাকুলে হর পঞ্চমমুখে।
গোবিন্দের গুণ গাহেন সুখে॥
ঈশান বিষাণ বাজান রঙ্গে।
ডমরু ডিণ্ডিম সুতাল সঙ্গে॥

জগঝম্প দম্ফ ঝর্ঝরা ভেরি।
বাজে বীণা বেণি বরঙ্গ তুরি ॥
মধুর মৃদঙ্গ মন্দিরা তবে।
দৃমিকি দৃমিকি দৃমিকি রবে॥
তাতিনি তাতিনি তাতিনী তা
তালে তালে চলে ভবের পা ॥"

বিভিন্ন ছন্দেরনির্ভুল ও সার্থকপ্রয়োগেও কবির নৈপুণ্যেরপরিচয় পাওয়া যায়। 'গঙ্গামঙ্গলে' পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ছড়াও একাবলী ও ললিত ছন্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে অকিঞ্চন তাঁহার দেশবাসী রামেশ্বরের সমসাময়িক ছিলেন। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' রচিত হইবার বহু পরে অকিঞ্চন পরিণত বয়সে 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র চব্বিশ বৎসর পরে অকিঞ্চন এই কাব্য রচনা করেন। সেইজন্য রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের প্রভাব এই কাব্যের উপর কিছু লক্ষ্য করা যায়। তবে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা রামেশ্বরের প্রভাবই কবির উপর অধিক মনে হয়। রামেশ্বরের 'শিবায়নে'র কয়েকটি ভণিতার সহিত অকিঞ্চনের 'গঙ্গামঙ্গলে'র কয়েকটি ভনিতার অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়, যেমন রামেশ্বরের একটি ভণিতা—

"চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥" (শিবায়ন)

'গঙ্গামঙ্গলে' অকিঞ্চনের একটি ভণিতা—

"চক্রপাণিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ।
বিরচিল্যা ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চন॥"

রামেশ্বরের আর একটি ভণিতার সহিত অকিঞ্চনের অপর একটি ভণিতার মিলও নিম্নে পরিস্ফুট হইবে—

"মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম, রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত" (শিবায়ন)

অকিঞ্চনের ভণিতা

"মনোহর মধুক্ষার মোক্ষদার গীত।
রচিলা কবীন্দ্র রমানাথের সংপ্রীত" (গঙ্গামঙ্গল, উত্তরাংশ পত্র ৭ পৃঃ ১)।

রামেশ্বর ও অকিঞ্চনের কাব্যসমাপ্তির ভাষাও ভঙ্গী কতকটা এক। শিবায়নের সমাপ্তিকালে রামেশ্বর বলিয়াছেন—

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
রাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে আইল যেন পিযূষের ধারা॥"

অকিঞ্চন ও গঙ্গামঙ্গলের পরিসমাপ্তিকালে প্রহেলিকার সাহায্যে সময় নির্দেশ করিবার পর বলিয়াছেন—

"পুরাণপ্রসঙ্গ পুণ্যদিনে হৈল্য সারা।
পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিযূষের ধারা॥"

এইরূপ বহুস্থলে রামেশ্বরের ভাষার সহিত অকিঞ্চনের ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অকিঞ্চনকে রামেশ্বরের অন্ধ অনুকরণকারী বলা যায় না। গঙ্গামঙ্গলে রামেশ্বরের শিবমঙ্গলকাব্যের ন্যায় প্রকৃত লৌকিক চরিত্রসৃষ্টি ও সরল গ্রাম্যজীবনের ছবি অঙ্কনের অবকাশ অল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত এই কাব্যে অকিঞ্চন পুরাণকে পাঠকসাধারণের নিকট নূতন করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে একদিকে ভারতচন্দ্রের ভাষার দীপ্তি অন্যদিকে রামেশ্বরের ন্যায় লৌকিক চরিত্রসৃষ্টির যুগপৎ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যকে রাজকণ্ঠের মণিমালার ন্যায় ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যে প্রতিভায় রামেশ্বর গ্রামীণসমাজের জীবন্ত চিত্র অঙ্কনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রে তাহার অবকাশ খুবই অল্প। অকিঞ্চনের কাব্যে রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের প্রতিভার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গামঙ্গল কাব্যটি পুরাণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও পৌরাণিক আভিজাত্য ইহাতে বিশেষ রক্ষিত হয় নাই। ইহাতে একদিকে যেমন গ্রামীণ সমাজের গঙ্গামাহাত্ম্যশ্রবণের অভিলাষ পূরণ করিয়াছে গ্রাম্যজীবনের বোধগম্য ভাষার মাধ্যমে, অন্যদিকে কাব্যরসিক বিদ্বজ্জনের নিকট পাণ্ডিত্য ও কাব্যরসও পরিবেশন করিতে পরিয়াছে। মনে হয় দীর্ঘজীবী অকিঞ্চন রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্যধারা হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া পরিণত বয়সের রচনাটিতে তাহা কাজে লাগাইবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তাই এই কাব্যটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকিবে। কাব্যের প্রান্তভাগে কবি সবিনয়ে তাঁহার কবিত্বের দৈন্য প্রকাশ করিয়া গঙ্গাহরিনামের দ্বারা পাপধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন—

"আমি অল্পবুদ্ধি অতি উপমা কি দিব,
গোবিন্দে প্রার্থনা করি অন্তে গঙ্গা পাব॥
হরষিতে হরি বল হোক পাপধ্বংস।
শুনিলে গঙ্গার গীত সুখী পূর্ব্ববংশ।"

(গঙ্গামঙ্গল : উত্তরাংশ, ৯ম পত্র পৃঃ ২)

বাংলা লোকসঙ্গীতের সামাজিক পটভূমি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকসঙ্গীত লোককৃতির (Folk-lore) এক বিশিষ্ট অঙ্গ। যা সাধারণ মানুষের সৃষ্টি তাই লোককৃতি। কে যে তা প্রথম সৃষ্টি করল কেউ তা জানে না। কোন মানুষ প্রথম চাকা উদ্ভব করল কেউ তা জানে না; সেই চাকাকে ভিত্তি করেই বর্তমানকালের প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। রেল, মটর, এরোপ্লেন সবই চাকা না হলে অচল। তা একটি শ্রেষ্ঠ লোককৃতির উদাহরণ। যে সব ঘুম-পাড়ানি ছড়া বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত আছে তাদের রচয়িতা কে জানা যায় না। গ্রন্থে তারা কোনদিন স্থান পায় নি, বিভিন্ন মায়ের মুখে আবৃত্তি হয়ে তারা রক্ষিত হয়ে এসেছে। লোকসঙ্গীত ও এইভাবে অজানা রচয়িতার রচিত এবং সাধারণ মানুষের মুখে নানা উপলক্ষ্যে প্রচারিত হয়ে রক্ষিত হয়ে এসেছে।

বাংলা লোক সঙ্গীতের ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। বর্তমান যুগের সংঘাতে হয়ত তার জনপ্রিয়তা কমে গিয়ে একদিন তা লুপ্ত হয়ে যেত; কারণ এই গানগুলি লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল না। অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ভাগ্যক্রমে সেগুলি সংগৃহীত হবার পর লিখিত আকারে সংকলিত হয়েছে। এই সংকলন গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমানে যা বাংলাদেশ উভয় অঞ্চল হতে সংগৃহীত হয়েছে; কারণ উভয় দেশই একই লোককৃতির উত্তরাধিকারী। এই সঙ্গীতগুলির সামাজিক পটভূমিকা কি ছিল তাই বর্তমান প্রবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয়।

বাংলা লোকসঙ্গীতগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন, কোন অঞ্চলে তাদের প্রচার, কোন রীতিতে সেগুলি গাওয়া হয়, তাদের বিষয় কি। ভাদু ও টুসু গান পশ্চিম বাংলায় প্রচলিত। ভাদু আদিবাসীদের বেশী প্রিয়! টুসু লৌকিক শস্য উৎসব! গম্ভীরা উত্তর বাংলার গান। ভাটিয়ালি পূর্ববাংলার নদী মাতৃক অঞ্চলের গান। ভাটিয়ালি একা গাওয়া হয়; তার স্বরবিন্যাসেও স্বাতন্ত্র্য আছে। এদিকে জারি গান অনেক গায়কের ঐক্যবদ্ধ সঙ্গীত। সঙ্গীতের বিষয়ের মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। কোনও সঙ্গীত বিবাহ আদি বিভিন্ন সংস্কার উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়। কোনও গান পূজা-পার্বন উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়। যেমন মনসা, বনদুর্গা, ঘেঁটু, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা আছে, তেমন রাধা-কৃষ্ণ ও রাম-সীতা কাহিনী, মাণিকপীরের কাহিনী ও এই শ্রেণীর সঙ্গীতের বিষয়। এগুলিকে ধর্মসম্পর্কিত সঙ্গীত বলা যেতে পারে। তারপর প্রেমের সঙ্গীত আছে; তার তালিকাও বেশ বড়। তারপর কর্মের সঙ্গে জড়িত সঙ্গীত আছে; যেমন ছাদ পেটার গান, বাইচের গান, চাষের গান, ধানভানার গান। এমন গানও আছে যা কোনও শ্রেণীতে ফেলা যায় না।

এদের মধ্যে পরোক্ষভাবে যে তথ্য ছড়ান রয়েছে তা হতেই এই সঙ্গীতগুলির সামাজিক পটভূমি আহরণ করতে হবে। তবে আপাতদৃষ্টিতেই বোঝা যায় যে ধর্মসম্পর্কিত যে সব সঙ্গীত আছে তাদের মধ্যে প্রসঙ্গিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যাবে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে অন্য শ্রেণীর সঙ্গীতের উপর। ইংরেজ আমলের আগে গ্রামাঞ্চলে যে সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল, তাই ছিল প্রধানত এই লোকসঙ্গীতের পটভূমি। তবে দেখা যায় এই রীতির সঙ্গীত এখনও রচিত হচ্ছে, কারণ প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক সংস্কৃতির সংঘাতের চিহ্নও কোন কোন সঙ্গীতে লক্ষ্য করা যায়। যে সংস্কৃতি এই সঙ্গীতগুলির পরিবেশ রচনা করেছিল তার গতি ছিল ধীর; গরুর গাড়ী তার প্রতীক। কিন্তু এমন সঙ্গীতও দেখা যায় যেখানে মটর গাড়ীরও উল্লেখ আছে। সহজেই বোঝা যায় এগুলি অতি সম্প্রতি রচিত। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে:

আর বুড়া চলতে নারে পথ রে
চাপায়ে দেব ট্যাক্সি মোটরে।

(টুসু, বাঁশপাহাড়ি)

বলা বাহুল্য এই ধরণের তথ্য আমাদের কোন কাজে লাগবে না।

এই সঙ্গীতগুলি হতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হতে দেখা যায়, তাদের পটভূমি হল এক কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি। তখন খরিফ ও রবি ফসল উৎপাদন করে মানুষ জীবিকা অর্জন করত। বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে ফলের গাছ থাকত; তা হতেও কিছু অর্থাগম হত। সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ীতে পুকুর ও থাকত। এই ছিল মোটামুটি সাধারণ অবস্থা। আমাদের এই প্রতিপক্ষের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত হতে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত সমাজজীবনের নানা দিক তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে।

বাড়ীর পরিকল্পনা সম্পর্কে এই সঙ্গীতাংশটি দেখা যেতে পারে:

ওরে বান্ধিনু বাড়ী, গুয়া উনু সারি সারি
গুয়ার বাগুচা ঘিরিয়া লইল বাড়ীরে।
আসিবে মোর প্রাণের গুয়া
তায় পাড়াইবে গাছের গুয়া।

(ভাওয়াইয়া)

দেখা যায় বাড়ীর চারিধারে সুপারি গাছ লাগান হত। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলায় সুপারি ফলে। তার আর্থিক মূল্য আছে বলে সুপারির প্রতি আকর্ষণ।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল বলে জমির ওপর বিশেষ টান, জমিকে মানুষ প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। পুরুষানুক্রমে তা পরিবারের খাদ্য জুগিয়েছে; তাই তার সঙ্গে একটি গভীর মমত্ববোধ। সেই মমত্ববোধ সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে নীচের সঙ্গীতাংশে:

হারে আমার কাতি শাল
বছর বছর থাকিস রে বহাল।

উঁহুই আমাদের মাতা পিতা
উঁহুই আমাদের নাতি ছাওয়াল।
সাতপুরুষের জমিন হামার
তিন পুরুষের হাল।

(পুরুলিয়া)

এই সঙ্গীতে শুধু জমির ওপর মমত্ববোধ ফোটে নি অতিরিক্ত ভাবে দেখা যায় যে শালি ধানই চাষীর প্রধান নির্ভর।

পূর্ববাংলায়, বিশেষ করে মৈমনসিংহ জেলায় পাট চাষও একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, এখনও আছে। চাষী পাট উৎপাদনের সাফল্যের ওপর এত মূল্য দিত যে তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করত। পাটের জন্য জমি প্রস্তুত করে, পাট উৎপাদন ও বিপণ্ন করে তার সমগ্র বৎসর অতিবাহিত হত। তাই পাট নিয়ে দেখি 'বারোমাস্যাও' রচিত হয়েছে। সম্পর্কিত সঙ্গীতের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তা হতে দেখা যাবে এই অঞ্চলে চাষীর জীবন পাটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত :

মাঘ না মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম আল
লাঙ্গল ভাঙ্গলাম, জোয়াল ভাঙ্গলাম, আর ভাঙ্গলাম ফাল।

*　　*　　*　　*

চৈত্রি না মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা
নাল্যা ক্ষেতে গোবর ফালতে শরীর করলাম কালা।

*　　*　　*　　*

শাউনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল ফুল
নাইল্য বেচ্যা কিন্সা আনবাম ভাউজের লাগ্যা নাকফুল।

*　　*　　*　　*

অগ্রাণ মাসেতে ভাইরে সব নয়া খায়
নাল্যা বেচার যত টাকা খাজনা-ফাজনায় যায়। (মৈমনসিংহ)

দেখা যায় সারা বছর পাট বোনা ও পাট বেচায় জীবন অতিবাহিত হত। তা হতেই খাওয়া এবং তা হতেই খাজনা ও ঋণ শোধ! তাই 'নাইল্যার' জন্য খেটে খেটে শরীর কালো করতে চাষীর দুঃখ নাই।

শীতকালে ও যে কিছু কিছু অতিরিক্ত রবিশস্য উৎপাদন হত তার ও প্রমাণ পাওয়া যায়। নীচের সঙ্গীতাংশটি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

আসিলো কাত্তিকো মাস
গোম সরিষা ক্ষেতে ক্ষেতে
বছর (মরসুম) গেলে কি করিবে চাষারে।

(ভাওয়াইয়া)

দেখা যায় সেকালে উত্তরবঙ্গে গমচাষের ও প্রচলন ছিল। সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশে গম চাষ প্রায় উঠে গিয়েছিল। এখন সরকারের উদ্যোগে গমচাষের নুতন করে প্রবর্তন হয়েছে।

সঙ্গীতগুলি হতে যা তথ্য পাওয়া যায় তা হতে সেকালের পারিবারিক পরিবেশের ও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় তখন একান্নবর্তী পরিবার প্রচলিত ছিল। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ভাসুর, ভাদ্রবৌ, স্বামী, দেবর নিয়ে মেয়েদের সংসার করতে হত। বাড়ীর বউ-এর ওপর পুরুষদের অত্যাচার ও যথেষ্ট ছিল। স্বামীর হাতে মার খেতেও হত ; কিন্তু পরিবারের মেয়েদের কাছ থেকেও সহানুভূতি পাওয়া যেত না। পুরুষশাসিত সমাজে এমনই নিষ্ঠুর নিয়ম! এই প্রসঙ্গে নীচের সঙ্গীতাংশটি দেখা যেতে পারে :

আমার শ্বশুর করে খুসুর খুসুর ভাসুর করে গোঁসা
নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শ্বাশুড়ী আছে ননদী আছে আছে ভাইগনা বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আটগাইল না কেউ।

(চটকা, জলপাইগুড়ি)

তা সত্বেও কোন কোন নারীর ভাগ্যে স্বামীর ভালবাসা যে জুটত না তা নয়। তার কাছে উপহার ও মিলত ; কিন্তু তার এমনভাবে ব্যবস্থা হত যাতে পরিবারের অন্য মানুষ তা জানতে পারত না :

বছর দিনের বড় পরব দাদার আছে গো সবাই মনে
দশ টাকা দামের শাড়ী লিলি কাণফুল দিলি কই কানে।
আসছে বছর কাণফুল লিবি টাকা রাখবি গোপনে
শাশুড়ি ননদ জানতে পালে গাল দেবে তোরে দুই জনে।

(টুসু, বাঁশ পাহাড়ি)

সমাজব্যবস্থা এমন নিষ্ঠুর হলেও মেয়েদের তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই মায়ের কাছ হতে নীরবে এই সব সহ্য করতে উপদেশ পেত। বিবাহের পর পতিগৃহে যাবার মুখে মায়ের উপদেশ বাণীতে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশে তা সুন্দর ফুটে উঠেছে :

বিষ খাইয়া বিষ হজম কইর‍্যা কন্যা তুমি যাইকো
জামাইর ঘরে।
শাশুড়ী ননদীর কথা কন্যা তুমি শুইনো মন দিয়া
হই না যেন কলঙ্কিনী কন্যা তোমার গর্ভেতে ধরিয়া।

(মৈমনসিংহ)

আবার দেখা যায় বড়লোকের মেয়ে ঘরের বউ হয়ে আসলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার সুযোগ নিতেও ছাড়ত না। সেই অজুহাতে সংসারের কাজ হতে ছুটি চাইত। তার একটি সুন্দর উদাহরণ পাই নীচের সঙ্গীতাংশে :

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই ভাত রান্ধিবার
মুই ত মোড়লের বিটি
ভাত রান্ধিবার না জানি
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনি।

(চটকা, কুচবিহার)

দেখা যায় গ্রামের সমাজে কন্যার পিতার বিবাহে পণ নেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও আছে; কারণ মেয়েদের একটা অর্থনৈতিক মূল্য এই সমাজে আছে। তারা গরুর যত্ন করে, ক্ষেতে কাজ করে, বাজারে জিনিষ বেচে; ঘরের কাজ ত আছেই। এই পণ প্রথার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে লোভী পিতা বেশী পণ নিয়ে মেয়েকে বুড়ো বরের হাতে তুলে দিত। মেয়ের বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু স্বভাবতই বুকভরা দুঃখ নিয়ে সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করত। তার একটি পরিহাসযুক্ত সুন্দর পরিচয় নীচের সঙ্গীতাংশে পাওয়া যায়:

একশ টাকা লিলি বাবা দিলি বুড়ো বর হে
বরের সঙ্গে যাতে হল পুরুলা সহর গো।
পুরুলার লকে বলে ইটা তোমার কে বটে
লজ্জাকে কারণ বলি ঠাকুরদাদা বটে গো।

(পুরুলিয়া)

মনে হয় সেকালেও অতিথি সৎকারের একটি রেওয়াজ ছিল। অতিথি আপ্যায়নের জন্য যে ভোজনের আয়োজন হত তা হতে সেকালের উপাদেয় ভোজ্যেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেই হিসাবে নীচের সঙ্গীতাংশটির বিশেষ তাৎপর্য আছে:

আরে আমার বাড়ী যাইও রে মৈশান, বসতে দিমুরে পিড়ি
আরে জলপান করিতে দিমুরে মৈশান, শাইল ধানের মুড়ি রে।
শাইল ধানের মুড়ি নারে মৈশান, বিন্নি ধানের খৈ
আরে পেটমোটা সবরি কলা রে মৈশান, গামছা বান্দা দই রে।

(ভাটিয়ালি)

একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার এই যে দই এমন জমেছে যে গামছায় বাঁধা যায়। এমন দই আজকাল পাওয়া যায় কিনা জানি না। তবে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গায় এমন দই পাওয়া যায় শুনেছি যা হাঁড়ি উপুড় করলেও পড়ে যায় না।

এবার কিছু আনুষঙ্গিক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সঙ্গীতগুলিতে মেয়েদের প্রসাধনের রীতি বা সামগ্রী কি ছিল সে সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ কালো হলেও ফর্সা রঙের প্রতি আমাদের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। তাই কালো রঙকে কৃত্রিম উপায়ে উজ্জ্বল করবার চেষ্টা সমাজের সকল স্তরের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। সেকালের গ্রামের পরিবেশে এই

উদ্দেশ্যে হলুদ গায়ে মাখবার একটা রীতি প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ নীচের উদ্ধৃতি হতে পাওয়া যাবে :

কে বলেরে কে বলেরে আমার টুসু কালোরে
বিষ্টুপুরী হলুদ এনে গা করিব আলো রে।

আমাদের দেখে নারীর মুখের শোভার একটি মূল উপাদান হল ঘন কেশের গুচ্ছ। এই কেশের যত্ন নেওয়া বেশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রোজ চুল আঁচড়াতে হয়, খোঁপা বাঁধতে হয়। তেল মাখালে তা উজ্জ্বলতা লাভ করে। কিন্তু এমন অনেক দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার আছে যাদের মাথার তেল কেনবার পয়সা জোটে না। অগত্যা বিনা তেলেই খোঁপা বাঁধতে হয়। যাদের ভাগ্যে এমন হয় তাদের প্রসাধনে ত্রুটি থেকে যাওয়ায় তাদের মনে একটা ক্ষোভ জমে ওঠে। নীচের খেদোক্তিতে সেই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :—

বড় ঘরের বড় বিটি লাচা লাচা চুল,
বিনা তেলের খোঁপা বাঁধা যেমন জীউর ফুল। (পুরুলিয়া)

মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। কাজেই মাছ ধরার রীতি সেকালে প্রচলিত ছিল। খাবার জন্য পাখী ধরবার ও রীতি ছিল। কিন্তু মেয়েদের ওপর ও যে মাছ ধরবার, এমন কি পাখী ধরবার ভার পড়ত তা জানা ছিল না। নীচের সঙ্গীতাংশে তার খবর আমরা পাই :—

মাছ মারবে কন্যা ইলিসা, মাছ মারবে কন্যা খলিসা
বেছে মৈছ মার, মার চন্দনা আর কুরুসারে। (ভাওয়াইয়া)

এটি উত্তরবঙ্গের গান। দেখা যায় নির্বাচিত করে ইলিশ আর খলিসা মাছ মারবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এদের কাছে এই দুটি মাছ প্রিয় ছিল বোঝা যায়।

আরও দেখা যায় বেগুন পোড়া ও একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। আমাদের বাঙালীদের কাছে বেগুন পোড়া একটি প্রিয় খাদ্য এখন ও আছে, কারণ তার একটি স্বতন্ত্র আস্বাদ আছে। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মেয়ের মনে পড়ে বাপের বাড়ী মায়ের কাছে বেগুনপোড়া খেয়েছিল। সেই সুখ স্মৃতির প্রেরণায় আবার তা খেতে ইচ্ছা করে। তাই শ্বশুরবাড়ীতে সম্ভবত প্রিয় ননদিনীকে বেগুনপোড়া খাওয়াতে অনুরোধ করা হয়েছে নীচের সঙ্গীতের অংশে :

মৎস্য, পোড়া বেগুন, তরিতরকারী
রতি লো, এই সব এনে দে মোরে।
রতি লো, ছোটকালে খাইছি বাপের ধাম। (ঢাকা)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অপহরণের কাহিনীর ও কোন কোন সঙ্গীতে উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ববাংলায় প্রচলিত ভাটিয়ালি গানে প্রতিফলিত। বড় বড় নদীতে যখন তুফান ওঠে তখন ঢেউয়ের মধ্যে মাঝি বড় অসহায় বোধ করে এবং তখন কোথায় দূরে তার আপন জন পড়ে আছে তার কথা মনে পড়ে। তার সুন্দর একটি ছবি নীচের সঙ্গীতাংশে পাওয়া যায় :

বন্ধুরে কূল কিনারা নাই উঠছে কত ঢেউ
এমন নিদান কালে সঙ্গী নাই মোর কেউ।
বন্ধু কই রইলা রে। (ভাটিয়ালি)

দেখা যায় সেকালে দেশের দক্ষিণ অংশে মগের উপদ্রব ছিল। লুঠ তরাজ ছাড়া ও তারা নদীতে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তাকে অপহরণ করেও নিয়ে যেত। এমন একটি অভাগিনীর মুখ দিয়ে বলান হয়েছে যে বাড়ীর পুকুরে স্নান না করে, নদীতে স্নান করতে গিয়ে এই বিপদ ঘটল :

বাড়ীর মধ্যে পুকুর ছিল চান করিতাম ভালো।
গাঙের ঘাটে চান করিতাম আমায় মগে ধরে নিল।
(খুলনা)

আমাদের দেশে মশার উপদ্রব যে অনেক কালের জিনিষ তার খবর ও আমরা লোক সঙ্গীতে পাই। তার উল্লেখ করেই বর্তমান আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। বর্তমান কালে ও আমরা সারা জীবন মশার উপদ্রবে ভুগছি। আমাদের প্রযুক্তি বিদ্যাও তার হাত হতে মুক্তির উপায় এখনও বার করতে পারে নি। ডি ডি টি ছড়িয়ে দেয়াল বিষাক্ত করে দিলে কেবল এনোফিলিস জাতীয় মশা বিনষ্ট হয়, কারণ তাদের স্বভাব দেয়ালে বসা। ফলে ম্যালেরিয়া নিবারণ হয়। কিন্তু কিউলেকস জাতির মশার অভ্যাস ভিন্ন বলে তাদের ওপর তা কাজ করে না! তাদের অত্যাচার পূর্ণমাত্রার সহরেও এখন ও বজায় আছে। কাজেই মশার জ্বালায় আমরাও ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং যে অজানা সঙ্গীতর চয়িতা মশার উপদ্রবের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর জ্বালা আমরা একালের মানুষ হয়ে ও খুব হৃদয়ঙ্গম করব। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতাংশটি এই :

এ মশারে,
তুমি দিনে থাক বাগিচায় ফের ডালে ডালে।
পঞ্চস্বরে বাদ্য কর্য়া আস সন্ধ্যাকালে।
রে মশারে তোর জ্বালাতে।
(পাবনা)

লৌকিক দেবতা—বারাঠাকুর

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র আদিম মানবদের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা এই প্রকৃতি পুঞ্জে লুকিয়ে থাকা একশ্রেণীর মহাশক্তিশালী জীব-দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। তাদেরই তুষ্টি সাধনের ওপর নির্ভর করে মানুষের রোগ-শোক, প্রাকৃতিক যত দুর্বিপাক, এবং যাবতীয় ঐহিক দুঃখ থেকে মুক্তি। তার জন্য তারা ঐ সব কাল্পনিক জীবের নানা রকম কিম্ভূত কিমাকার অবাস্তব মূর্তি তৈরী ক'রে খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজার্চনা করত ; আনন্দ দায়ক কিছু পেলে নৃত্য করত এবং দুঃখ দায়ক কিছু পেলে কাঁদত। সর্বমঙ্গলময় প্রেমের দেবতার ধারণার আবির্ভাব মানব সমাজে তখনো হয়নি। এগুলি আদিম দেবতা নামেই সাধারণ্যে অভিহিত। এরূপ একটি দেবতা—যার প্রচলিত নাম 'বারাঠাকুর' তার উৎস সন্ধানে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

বহুল পূজিত ও প্রচারিত এই দেবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার পণ্ডিতকুল এবং পূজারী ব্রাহ্মণ কুল বিস্ময়কর ভাবে নীরব ও উদাসীন। অথচ কয়েক সহস্র বৎসর ধ'রে দক্ষিণ বাংলায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রায় প্রত্যেক হিন্দু-এর পূজা করেন, সংখ্যার সীমা যার কয়েক লক্ষে।

আলোচনার প্রারম্ভে এই দেবতার আকৃতিগত ও পূজায় প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই দেবতা দু'টি এবং মুণ্ড মূর্তি। মাথার মুকুটটি বড় পান পাতার মত ; তাতে বন্য লতা-পাতা আঁকা। গলা পর্যন্ত ফাঁপা। একটা কাঠির সাহায্যে থানে (বেদীতে) মাটির শরার ওপর বসান হয়। দুটি চোখের ও কানের গড়নে আদিমতার চিহ্ন স্পষ্ট। দুপাটি লম্বা দাঁতের সারি বাইরে প্রকাশমান। দাড়ির নীচে গালপাট্টা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। সাদা রঙের মুখ মণ্ডলে আকর্ণ বিস্তৃত কালো গোঁফ। মুণ্ড মূর্তি যেখানে যুগ্ম থাকে, তার মধ্যে একটি স্ত্রীমূর্তি ; আর স্ত্রীত্বের একটি মাত্র নিদর্শন, তার গোঁফ নেই। বাকী সমস্ত নিদর্শনই উভয় মূর্তির এক ; এমন কি দাড়ির নীচে গাল পাট্টাটি পর্যন্ত।

পূজার সময়—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১লা মাঘ হলেও সারা মাঘ মাস ধরে পূজা নিতান্ত কম হয় না। পণ্ডিত প্রবর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যদিও বলেছেন, "পৌষ সংক্রান্তির দিনেও পূজা হয়।"... (১) ; কিন্তু দীর্ঘ দিনের অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, তার প্রমাণাভাব আর হলেও আজ তা অতীব বিরল। সর্বাধিক পূজা দিনমানে হলেও রাত্রিকালে এর পূজা নিতান্ত কম হয় না।

(১) রায় মঙ্গল। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩০৩ সাল। পৃঃ ২২৪-৪৮

মুণ্ড মূর্তির সমুখে খুব ছোট ছোট দুটি ঘট পাতা হয়। পুজোপচারের মধ্যে সাধারণ নৈবেদ্য ভিন্ন মাছ মাংসও থাকে। ছাগ বলি হয়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে মুস্তফী মহাশয় বলেছেন, "হিন্দুরা। ছাগ বলি দেয়, মুসলমানেরা হাঁস, মুরগী হালাল করে।"
শোলার ফুল দিয়ে পূজার থান্ সাজিয়ে ঢাক-ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে সমারোহের সঙ্গে এই দেবতার বার্ষিক উৎসব পালিত হয় এবং মাঘ মাসের মধ্যে একদিন ব্যতীত সম্বৎসরের মধ্যে আর কোন দিন পূজা হয় না। আর্যব্রাহ্মণেরা এর পূজা করলেও এবং সর্বস্তরের হিন্দুর ঘরে পূজিত হলেও প্রায় সব লৌকিক দেবতার ভাগ্যে যা ঘটে এঁদের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি; অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দু অপেক্ষা নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যেই এঁরা অপেক্ষাকৃত বেশী সমাদৃত।

পূজার স্থান—গৃহাভ্যন্তরে নয়। বনে-জঙ্গলে, মাঠে কিংবা বার-বাড়ীতে, বৃক্ষমূলে অথবা উন্মুক্ত স্থানে। ফলে ভক্ত সমাবেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের আধিক্য থাকে। এ-মূর্তির কিন্তু বিসর্জন হয় না, সারা বছর বেদীর ওপরে থেকে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়'। কিন্তু এই দেবতাটি কে, উৎপত্তির ইতিহাসই—বা, কী এবং কোন্ কামনায় এদের পূজা, এ-সবের উত্তর এখনো আমরা পাইনি। এবার আমরা সেই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হব।

দীর্ঘদিন ধরে এ-সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করা কালীন প্রায় শতাধিক অভিজ্ঞ পুরোহিত ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করে দেখেছি পনের ষোলটি নামে এই দেবতার পূজা হয়। বলা বহুল্য, প্রকৃত পরিচয় জানা থাকলে নামের এত পার্থক্য থাকত না। সে-নামগুলি হচ্ছে,—দক্ষিণরায় (দক্ষিণ দ্বার বা দক্ষিণদর), বাস্তু, ক্ষেত্রপাল, ধর্মঠাকুর, গণেশ, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি। আর স্ত্রী-মূর্তির নাম করণে দেখা যায়, নারায়ণী (গণেশ জননী) লক্ষ্মী, গ্রাম্য দেবী বা বন দেবী। আমার স্বর্গত পিতৃদেব পণ্ডিত সুষেণচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের কাছে শুনেছিলাম, পুরুষ দেবতাটির নাম, 'কুড়োন্ ঠাকুর।'

শেষোক্ত নামটি ভিন্ন উপরোক্ত দেবদেবীর সব নামগুলিই যে অলীক কল্পনা মাত্র,' এ-আলোচনায় আরও অগ্রসর হ'লে আমরা তা বুঝতে পারব। পূর্বোক্ত সব দেবদেবী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব না হলেও সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত কয়েকটি দেবতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারেও কিছু না বললে এ-প্রবন্ধ অসমাপ্ত থেকে যাবে।

উল্লেখ্য যে, "বারা ঠাকুর কে?" এই নামে একটি প্রশ্ন একটি সংবাদপত্রের মারফৎ উত্থাপিত হয়েছিল। তার উত্তরে দুজন উত্তর দাতার একজন বলেছেন 'ব্রহ্মা', অপরজন 'ক্ষেত্র পালের' নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রথমেই আমরা দক্ষিণ রায় সম্পর্কে আলোচনা করব। যেহেতু এই নামেই সর্বাধিক পূজা হয়।

বহু বিতর্কিত এই দেবতাটি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, তার

সবগুলিকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, একটি তথ্যই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। সেই তথ্যটি বলে, ইনি ঐতিহাসিক পুরুষ। সর্বাধুনিক সিদ্ধান্ত, যশোহর জেলার ঝিকরগাছার ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের অন্যতম রাজধানী দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'খাঁড়ি মণ্ডলে' তাঁর প্রধান সেনাপতি রূপে এঁর অভ্যাগমন ঘটে, ইসলাম ধর্মপ্রচারক, হিন্দু বিদ্বেষী গাজীদের অত্যাচার থেকে হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে (২ ক। খ)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' এই মুকুট রায় ও দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব কাল ১৬শ শতাব্দী বলে নির্ণয় করেছেন আর ঐতিহাসিক ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার বলেছেন, "মুকুট রায়ের রাজত্বকাল খৃঃ ১৩৩৮-৬৫ অব্দের মধ্যে।" (৩) কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঐ ১৪শ শতাব্দীরও ঢের আগে আলোচ্য দেবতার অস্তিত্ব। এ-ভিন্ন, দক্ষিণ রায়ের মূর্তি যেখানে যত আছে, সবগুলি প্রায় একই প্রকার; কিন্তু বাহন কোথাও ঘোড়া কোথাও বা বাঘ, তার আকৃতিগত সাদৃশ্য পূর্বোক্ত দেবতার সঙ্গে বিন্দুমাত্র নেই। মিল শুধু দেখা যায়, ১লা মাঘ, পূজার দিনটিতে। দক্ষিণ রায় ও বাবা ঠাকুর এই দুই দেবতার ১লা মাঘের পূজাকে 'জাঁতাল' পূজা বলা হয়। বুঝতে কষ্ট হয় না, জমকালো > জাঁকালো < 'জাঁতাল' শব্দটি অপভ্রংশে এসেছে।

১লা মাঘ, পূজার নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে অনেকে অনেক অলৌকিক ও নৈসর্গিক কারণ পরম্পরা আবিষ্কারে তৎপর হ'য়েছেন; যেমন, '১লা মাঘ উত্তরায়ণ আরম্ভের সময় বলে শুভ দিবস হিসাবে ঐদিন ধার্য করা হ'য়েছে।' কিন্তু এ-যুক্তির সমর্থনে প্রমাণাভাব, নিছক কষ্ট কল্পনা মাত্র। পক্ষান্তরে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্থানীয় জমিদার বারুইপুরের (২৪ পরগনা জিলা) রায়চৌধুরী বংশীয়দের কেউ ধব্-ধবে গ্রামে এই দেবতাকে যেদিন আনুষ্ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেদিনটি ছিল ১লা মাঘ। সেই দিন থেকে ঐ ১লা মাঘ তারিখটিই বার্ষিক উৎসবের দিন হিসেবে ধার্য হয় এবং ২৪ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের যত 'থান' বা মন্দির আছে, সর্বত্র তার প্রভাব পড়ে; কারণ পূর্বোক্ত 'ধব্ ধবে' গ্রামে (প্রাচীন নাম ভীখতাড়া) এই দেবতার মাহাত্ম্য জনমানসে প্রতিষ্ঠার সূচনা-পর্বে অপর সকল দেবস্থান অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ে এবং আজও তাই আছে। (৪)

(২। ক) সতীশ মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস।' মুকুট রায়। ১ম খণ্ড। এবং (২। খ) কুশদহ। ৩য় বর্ষ। শ্রাবণ—১৩১৮। ৪র্থ সংখ্যা। ৬৬ পৃঃ।

(৩) বঙ্গের অনন্ত সামন্ত চক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস। মুকুট রায়—৪৪ পৃঃ।

(৪) দঃ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার ঐ ধব্ ধবে গ্রামের ঐ বিখ্যাত মন্দিরে জাঁতাল পূজার আরম্ভকাল অনুঃ ২০০ শত বৎসরের বেশী প্রাচীন নয়।

এ ভিন্ন দক্ষিণ রায়ের কয়েকটি প্রচলিত ধ্যান মন্ত্রের মধ্যে বারা ঠাকুরের অস্তিত্ব অপ্রাপ্য। যেমন,—

(১) "চন্দ্র বদন চন্দ্র কায়। শার্দ্দূল বাহন দক্ষিণ রায়—" ইত্যাদি।

(২) "সাগর সঙ্গম সুন্দর কায়। ঘোটক বাহন দক্ষিণ রায়॥
ঢাল তরোয়াল টাঙ্গি হস্তে। দক্ষিণ রায় নমোহস্তুতে॥"

(৩) "সাগর সঙ্গম সুন্দর কায়। শার্দ্দূল বাহন দক্ষিণ রায়।
পঞ্চবক্ত্র সাবিত্রী হস্তে। সংকট তারণ দেব নমস্তে॥"

—প্রভৃতি প্রায় একই রকম আরও কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র আছে। এ-সব মন্ত্রের মধ্যেও আলোচ্য দেবতার আকৃতিগত এবং পরে আমরা দেখতে পাব, প্রকৃতিগতও কোন সাদৃশ্য নেই।

মাধবাচার্যের পর খৃঃ ১৬৮৬-৮৭ অব্দে রচিত নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গল' কাব্যে এই দক্ষিণ রায়ের কাহিনী প্রথম সার্থকভাবে কীর্তিত হয়। দক্ষিণ রায় কেন্দ্রিক এই কাব্যের উৎস সন্ধানে গেলে আমরা দেখতে পাই, রাত্রিকালে দক্ষিণ রায়ের স্বপ্নাদেশ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই দেবতার উৎপত্তির কারণ জানা যায় না। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে ইসলাম ধর্মপ্রচারক বড়খাঁ গাজীর যে যুদ্ধ কাহিনী উক্ত 'রায় মঙ্গল' কাব্যে পাতার পর পাতায় লেখা হয়েছে, সেই বড়খান্ গাজীর অস্তিত্বের একটা 'পাথুরে প্রমাণ' দেবার চেষ্টা করেছেন শ্রীযুক্তা নীলিমা মণ্ডল তাঁর 'দক্ষিণ রায় বনাম বরখান গাজী' নামক প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "খৃঃ ১২৯৮ অব্দে দরাপ খাঁ গাজীর শিলা লেখে উৎকীর্ণ বুরহান্ কাজী ও দরাপ খাঁর কুরশী নামায় প্রাপ্ত বরখান গাজী একই ব্যক্তি হইতে পারেন…।" (৫) প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি কিনা তা আজও স্থিরীকৃত হয়নি আর হ'লেও আমাদের এই ১৩শ শতাব্দীকে পিছনে ফেলে আরও এগিয়ে যেতে হবে এই দেবতার উৎস সন্ধানে।

দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে একটা কথা এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার খাঁড়ী অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের প্রথম আগমন ও রাজধানী স্থাপনের কথা নানা প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ থাকলেও পূর্বোক্ত বারুইপুর থানার ধবধবে গ্রামের ভিখতাড়া নামক স্থানে দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব কাল ৩০০ শত বৎসরের বেশী নয়। কারণ প্রামাণ্য সূত্রে জানা গেছে, এই গ্রামের এই দেবতার যিনি প্রথম পূজারী (দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ) ছিলেন, তিনি বর্তমান পুরুষ থেকে ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ। তাছাড়া, জমিদারী সেরেস্তার চিঠায় সন ১১২১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ রায়ের নামে জমী ও জমার হিসাব পাওয়া গেছে। তখন মন্দিরাদি কিছুই ছিল না, 'থানে' পূজা হোত, আর এই গ্রামের মন্দিরে দক্ষিণ রায়ের যে-মূর্তি আছে, তার বয়সও ২৫০ বৎসরের বেশী হবে না।

(৫) প্রবাসী। ১৩৫৮ সাল; জ্যৈষ্ঠ—১৮০ পৃঃ

এই সব কাহিনীর পটভূমিতে বিচার করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে," কবি কৃষ্ণ রাম, এই মুণ্ড মূর্তির আসল পরিচয় কিছু খুঁজে না পেয়ে, দেশে ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সংস্কৃতির এই ধারাটিকে আপন কাব্যের মধ্যে প্রক্ষেপ ক'রে দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুরকে এক দেবতায় পরিণত করে গেছেন আর দক্ষিণ বাংলার ভক্তিপ্রবণ মানুষ আর কিছু না পেয়ে কবি কল্পনাকেই স্বীকার করে নিয়েছে। হিন্দু ভারতের দেবদেবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তাই বোধ হয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-রচনা প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদের মুখ দিয়ে মহর্ষি বাল্মীকির উদ্দেশ্যে বলেছেন,—

".. ঘটে যা, তা সত্য নহে,

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি।" যাইহোক, দক্ষিণ রায় ও বারাঠাকুর অভিন্নজ্ঞানে, দূরস্থ অধিবাসীরা একই নামে পৃথক ভাবে পূজা করলেও ধবধবে গ্রামের মন্দির-সংলগ্ন অধিবাসীরা নিজ নিজ বাড়ীতে কেউ আর স্বতন্ত্র ভাবে বারাঠাকুরের পূজার আয়োজন না করে ঐ মন্দিরের দেবতার কাছেই পূজানুষ্ঠান করেন।

বাস্তুদেব ও ক্ষেত্রপাল : শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের পূজা পদ্ধতিতে দেখা যায় যে ক্ষেত্র পাল, বংক পাল ও নাগপালের সঙ্গে বাস্তুদেবের পূজা 'উত্তরায়ণ সংক্রান্তি-কৃত্য' (পৌষ মাসের শেষ দিন) বলে উল্লেখ করা হয়েছে,—১লা মাঘে নয়। বাস্তুদেবের ধ্যান মন্ত্র,—"শশধরং সমবর্ণং স্বর্ণহারো জ্জ্বলাঙ্গং কনকমুকুট চূড়ং স্বর্ণযজ্ঞোপবীত শোভিতং অভয় বরদ হস্তং সর্বলোকৈক নাথং ত্বমিহ ভুবনরূপং বাস্তুরাজং ভজামি।" এবং এর প্রার্থনা ও প্রণামের যে-মন্ত্র আছে, তার সঙ্গে বারাঠাকুরের কোন সম্পর্ক নেই। (৬) এই বাস্তুপূজার প্রচলন পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ; পশ্চিমবঙ্গে এই পূজা অতি বিরল ঘটনা।

ধর্মঠাকুর : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সাহিত্য পত্রিকায় (৭) এবং 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে' (৮) ধর্মপূজা সম্পর্কে বলেছেন, "রামাই পণ্ডিত (খৃঃ ১০ম—১১শ শতাব্দী) যে ধর্মপূজার প্রচলন করেন, তাহা মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতরূপ।" এ-মত আজও অখণ্ডিত। আর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "খৃঃ ১০ম শতাব্দী থেকে ধর্মপূজার প্রচলন হয়"—(৪৬-৪৮ পৃ)। সুতরাং এহো বাহ্য।' আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে; কেননা আমরা ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই দেখতে পাব, এই বিদেশী দেবতা তার বুনো চেহারাটা ত্যাগ করে সভ্য বাঙালীর চেহারা গ্রহণ করতে চলেছে।

(৬) সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য কৃত 'পুরোহিত দর্পন। ১৯শ সংস্করণ। ৪১৯ পৃঃ

(৭) ১৩০০ সাল। জ্যৈষ্ঠ-১১১ পৃঃ

(৮) ১ম খণ্ড। ১৬ পৃঃ

গণেশ : পূর্বোক্ত 'রায়মঙ্গল' কাব্যে একটি উপকাহিনী আছে। তাতে বলা হয়েছে, বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধে গাজীর খড়্গাঘাতে দক্ষিণ রায়ের মুণ্ডচ্ছেদ হয়। রায়ের এই মায়ামুণ্ড মাটিতে পড়ে গড়ায়। তখন স্বয়ং ঈশ্বর এসে এ'দের বিরোধ মিটিয়ে দেন। আর বহু শ্রুত, সেই শনির দৃষ্টিতে দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত গণেশের আদি মুণ্ড রায়ের স্কন্ধে এসে বসে।

"কাটা মুণ্ড বারাপূজা সেই হ'তে করে।
কোন খানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে॥" (পৃঃ ১৭)

গণেশ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে পূর্বোক্ত মুস্তফী মহাশয়ের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করলেই বোধ করি যথেষ্ট হবে। দক্ষিণ রায়ের স্কন্ধে গণেশের আদি মুণ্ড উড়ে-এসে-জুড়ে বসা-সম্পর্কে বলেছেন, "কল্পনা কারক (কবি কৃষ্ণ রাম) দিব্য চতুরতা করিয়াছেন। পৌরাণিক দেবতা গণেশও বিঘ্ননাশক আর গ্রাম্য দেবতা দক্ষিণ রায় ও ব্যাঘ্রভীতি হারক। সুতরাং দক্ষিণ রায়, দেবতা প্রকাশক মুণ্ডটিকে গণেশ মুণ্ড বলিয়া প্রকাশ করায় বেশ খাপিয়া গিয়াছে অথচ গণেশের বহুকাল হইতে নিরুদ্দিষ্ট মুণ্ডটির একটা সন্ধান ও সুব্যবস্থা হইয়াছে…"ইত্যাদি।

ব্রহ্মা, শিব ও নারায়ণ : এই সব দেবতার সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা সুধী সমাজের কাছে আছে বলে মনে করিনা। সন্ধিৎসু যে-কেউ শাস্ত্রীয় পূজা পদ্ধতি পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন, এরা হয় বৈদিক, না হয় প্রাচীন পৌরাণিক দেবতা। এই সব দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার কোন স্বাজাত্য নেই,—লৌকিক দেবতা সম্পূর্ণ পৃথক সৃষ্টি, আর বৈদিক, পৌরাণিক বা মঙ্গল কাব্যের দেবতা প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে যে, এদের নিয়ে সংস্কৃতে বা বাংলা ভাষায় অনেক ব্রত কথা, ছড়া বা গাথা রচিত হয়েছে; বিশেষ বাংলা দেশ তো ব্রতের দেশ। যার জন্য এদেশে তীর্থ দর্শন ভিন্ন অন্য কারণে এলে প্রাচীন যুগের আর্য জাতিকে 'ব্রাত্য' পতিত হ'তে হ'তো এবং তার শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধানও ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য দেবতার সম্পর্কে কোন ব্রতকথা ছড়া বা গাথা পাওয়া যায় না। সে-কারণেও মনে হয়, এই সকল দেবতার আদি বাসস্থান ছিল বাংলার বাইরে।

অতঃপর, স্ত্রী-মূর্তি সম্পর্কে লক্ষ্মীদেবীর আলোচনা অনাবশ্যক। কেবল নারায়ণী সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। এই নারায়ণীর সঙ্গে গোঁপহীনা এবং গালপাট্টা শোভিতা মুণ্ড মূর্তিটির স্বাজাত্য বা স্বাধর্ম্য কিছু আছে কিনা! না—তাও নেই। কারণ, 'ডাকার্ণব' তন্ত্র মতে যে ৬৪টি তান্ত্রিক মহাপীঠের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে অন্যতম হোল, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত খাঁড়ি পীঠ; যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'লেন 'নারায়ণী।' এই নারায়ণী কে? ইনি কি নারায়ণের লক্ষ্মী? তাঁর ধ্যানমন্ত্রের "সিংহ স্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালংকার ভূষিতাং চতুর্ভুজাং··" প্রভৃতি শব্দের সমন্বয়ে মনশ্চক্ষে যে-অবয়বটি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে এই গোঁফহীনা মুণ্ড মূর্তিটির বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায়

না। প্রধানত আকৃতিগত বর্ণনাই তো ধ্যানমন্ত্র? তাছাড়া এই তন্ত্রটিও অর্বাচীন। পক্ষান্তরে আলোচ্য দেবতার অস্তিত্ব আরও ঢের বেশী প্রাচীন—তাজেই আমাদের আরও এগোতে হ'বে।

প্রবন্ধের প্রথম অংশে আলোচনা হল সমস্যাটি কী? ২য় অংশে আলোচিত হল সে সমস্যার সমাধানে নানাজনের নানা প্রয়াসের কথা। ৩য় অংশে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

এই বারাঠাকুরের প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন, মজিলপুর (দঃ ২৪ পরগণা) নিবাসী ইতিহাস তপস্বী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত কালিদাস দত্ত মহাশয়। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয় আরও বিস্তৃত আলোচনা করেন; কিন্তু কোন্ কামনায় এই দেবতার পূজা বা কোন্ গুণে পূজা, সে কথা আজও অনালোচিত। স্বর্গত দত্ত মহাশয় প্রথম লেখেন, "নিম্ন বঙ্গে দুই আদিম দেবতা" (৯) ও "বারাঠাকুর (১০) নামক দুটি প্রবন্ধ। প্রভূত পরিশ্রমে তিনি আবিষ্কার করলেন, এই দেবতার উদ্ভব বাংলায় নয়, এর উদ্ভব দাক্ষিণাত্যে।

দক্ষিণ ভারতে 'কুট্টনদবর' (বা কুট্টন দেবর) নামে প্রস্তরে খোদিত এক মুণ্ডরূপী দেবতার পূজা আজও তামিল জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। হোয়াইটহেড সাহেব তাঁর—"The Village Gods of South India" নামক গ্রন্থে বলেছেন,—"(দক্ষিণ ভারতে) তামিল জাতির মধ্যে, বিশেষ দক্ষিণ আর্কট জেলায় 'কুট্টন দেবর' নামে এক দেবতা পূজিত হয়। মূর্তিটির রূপ-কল্পনায় দেখা যায়, বড় মুখোষের মত তার মাথা, উচ্চতা যার প্রায় ৩ফিট; মুখমণ্ডলে লালাভা। মুখ মণ্ডলের মধ্যে সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরানো গোঁফ জোড়া। ওপরের চোয়াল থেকে সিংহের মত দাঁতের সারি মুখের বাইরে বেরিয়ে আছে। একটা মোচার (কদলীপুষ্প) মত ক্রমশঃ সরু হ'য়ে ওঠা শিরোভূষণ তার মাথায়। পাথরের মূর্তিটির নীচে একটা ক্ষুদ্রাকৃতি পাথরের মস্তক, যেটি বৃহত্তর অবয়বের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা রূপ কল্পনা। পূজারী বললেন, এটি কুট্টন দেবরের প্রতীক্ স্বরূপ। (—বঙ্গানুবাদ)" গ্রন্থে চিত্রিত ছবির বর্ণনা এইরূপ :—

লম্বা মুখমণ্ডলে আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ। গলা পর্যন্ত মুণ্ড মূর্তি। কপালে ইংরেজী 'Y' অক্ষরের মত তিলক চিহ্ন, চোখ দুটি বর্তুলাকার, দুপাটি লম্বা দাঁত বাইরে প্রকাশমান। ভীষণ দর্শন। বড় পান পাতার মত মাথার মুকুট নয়, মাথায় ওপর চূড়ার মত লম্বা কী যেন। দুপাশে ঝালরের মত চুল অথবা কোন সাজ পোষাক ঝুলছে। পাশের ছোটটি ঐ বড় মূর্তির মতই অবিকল এক। এই আলোক চিত্রে গালপাট্টা আছে কিনা বোঝা যায় না।

(৯) প্রবাসী। ১৩৫৮ সাল, আষাঢ়। ২২৬ পৃঃ। (১০) ভারতীয় লোকযান—ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৯৬৭।

এই গ্রন্থে ঐ কুটুন দেবর ভিন্ন প্রস্তরে খোদিত 'বিসল-মারী' নামে প্রসিদ্ধ, মুণ্ডরূপী যুগ্ম দেবতার চিত্রও আছে। ঐ দুটি মুণ্ড মূর্তিও বারাঠাকুরের মত পাশাপাশি বসিয়ে পূজা করা হ'য়। গ্রন্থে চিত্রিত ছবি বর্ণনা এইরূপ :—

এই গ্রাম্য দেবতা দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। যেন কোন মন্দিরের কারুকার্য করা তোরণের মধ্যে। লম্বা ক্রমশঃ সরু হ'য়ে ওঠা মাথার চূড়া। মূর্তির চোখ, মুখ, গোঁফ স্বাভাবিক এবং ভীষণ দর্শন নয়। গালপাট্টা আছে কিনা ঠিক বোঝা যায় না। কোমর পর্যন্ত এর অবয়ব পরিদৃশ্যমান।

এছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ইষ্টার দ্বীপেও প্রস্তরে খোদিত মুণ্ডরূপী একটি যুগ্ম দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা নাকি মুণ্ড মূর্তি দুটি পাশাপাশি বসিয়ে পূজা করত। ঐসব মূর্তি কিম্ভূত কিমাকার (Grotesque), চোখ দুটির গড়ন পাখীর মত। (১১)

আলোক চিত্রে দেখা যায়, একখণ্ড প্রস্তরে ছোট বড় চারিটি ভীষণ দর্শন মুণ্ড মূর্তি, বৃহদাকার মূর্তির মধ্যে চোখ ও মুখের বড় বড় গহ্বর ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না যদিও, কিন্তু বোঝা যায় এগুলি এই বারাঠাকুরেরই আদিম রূপ। উচু নাকের অবস্থিতিও সে কথাকে প্রমাণিত করে। প্রস্তরের মধ্যে টুপী মাথায় আধুনিক কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়; শুনেছি, ইনি স্বয়ং গ্রন্থকার H. Whitehead সাহেব।

আমাদের আলোচ্য দেবতার সঙ্গে হোয়াইটহেড সাহেবের গ্রন্থে বর্ণিত মূর্তিগুলির আকৃতির হুবহু মিল দেখা যায়। প্রকৃতিগত মিলের কথা পরে বলছি। তবে বর্তমান আকৃতিতে আদিম বৈশিষ্ট্য থাকলেও কাল প্রভাবে যে তার যথেষ্ট পরিবর্তন (Sophistication) ঘটেছে, তা অনস্বীকার্য। এ-পরিবর্তন আজও চলছে। মাজিলপুর গ্রামে পাওয়া কতকগুলি মাটির ছোট ছোট পুতুল পাওয়া গেছে। পটুয়ারা এগুলিকে 'বারাঠাকুর' বলে হাটে-বাজারে বিক্রি করছেন। মাথায় ক্রমশঃ সরু হ'য়ে ওঠা লম্বা মত মুকুট ভিন্ন আর সব কিছু সভ্য, মার্জিত এবং সর্বাধুনিক যুগোপযোগী স্বাভাবিক মূর্তি। এর কিছু নিদর্শন, বারুইপুর থানার রামনগর গ্রামে 'রামনগর-গ্রন্থাগারের' সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত আছে।

আলোচ্য দেবতার দাড়ির নীচে গালপাট্টার যে-নিদর্শন দেখা যায়, তাও প্রাগৈতিহাসিক পরিচয় বহন করে। গালপাট্টা প্রদর্শনের রীতি আদিম জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। নিদর্শন স্বরূপ আফ্রিকার এক আদিম জাতির একখানি মুখোষের আকৃতিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হোল :—

'বর্তুলাকার মুখমণ্ডল, আয়ত দুটি চোখ, মাত্র দুটি দাঁত বাইরে বেরিয়ে আছে, দুই গণ্ডদেশের দুপাশে তিনটি করে ছয়টি উল্কির চিহ্ন, মাথায় পাখীর পালকের শিরো-

(১১) The Village Gods of South India—H. Whitehead. p. p.—26-27, Calcutta 1921.

ভূষণ এবং দাড়ির নীচে কৃষ্ণবর্ণ আকর্ণ বিস্তৃত গালপাট্টা অতি যত্নে লালিত।'—এটি এখন পোল্যাণ্ডের Warsaw Museum এর 'Primitive Culture of Central and East Africa' বিভাগে রক্ষিত আছে।

এই দেবতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছু 'পাথুরে প্রমাণ' দেওয়া আবশ্যক। উদাহরণ-স্বরূপ চারটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা হোল। দুটির উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে হোয়াইট হেড (১১) এবং স্বর্গত কালিদাস দত্ত (১০) মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে, এর পর—

(৩) মহেঞ্জোদারো থেকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়া মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে, যা দেখতে এই বারাঠাকুরের মত। (১২)

এরপর এটি সর্ব প্রাচীন নিদর্শন বলা যেতে পারে—

(৪) ২৪ পরগণা জিলার দক্ষিণাংশে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত 'হরিনারায়ণপুর' নামক গ্রামে হুগলী নদীর ভাঙ্গনের মধ্যে ঠিক এই বারাঠাকুরের মত দেখতে পোড়া মাটির মূর্তি আর তার সঙ্গে কিছু মানুষের হাড় এবং কিছু পাথরের অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। (১০) প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সেগুলিকে নব প্রস্তর যুগের বলে স্থির করেছেন। সেই পোড়া মাটির মূর্তির বর্ণনা :—

মাথার মুকুটটি বড় পান পাতার মতন। কান দুটি দুপাশে লম্বমান, চোখের অবস্থিতি অস্পষ্ট, দাঁত গুলি অদৃশ্য; কেবল মুখের কাছে একটা বাঁকা চোরা গহ্বর দেখা যায়। গলা পর্যন্ত কাটা ও গলাটি লম্বা।

এবার বোধ হয়, পরিষ্কার বোঝা গেল যে, দক্ষিণ রায়, ক্ষেত্র পাল, ধর্মঠাকুর, শিব, গণেশ বা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণের কেউই এই মুণ্ড মূর্তিরূপে পূজিত হ'তে পারেন না। আর দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে বিশেষ করে বলার কথা এই যে, এই দেবতার আবির্ভাব কাল যেখানে ১৬শ শতাব্দী (২-ক/খ) থেকে আরম্ভ করে ১৪শ শতাব্দীর (৩) পর ১৩শ শতাব্দী (৫) পর্যন্ত গবেষকদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সেখানে নব্যপ্রস্তর যুগে বা মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষে যদি তার অস্তিত্বের 'পাথুরে প্রমাণ' পাওয়া যায়, তবে কেমন করে স্বীকার করা যেতে পারে যে, উভয় দেবতা এক? তাছাড়া, দক্ষিণ রায় সর্বত্র আদি কাল থেকে একক ভাবে পূজিত হ'য়ে আসছেন; পক্ষান্তরে এই বারাঠাকুরের পূজা হয় প্রায় সর্বত্র যুগ্ম মূর্তিতে। সুতরাং এই দুই দেবতার অস্তিত্ব যে ভিন্ন, যে-বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ নেই।

এরপর আমাদের আলোচ্য বিষয়, কুটুন দেবর ও 'বিসলমারী'—স্বভাব ধর্মে এই দুই দেবতার পরিচয় কী?

(১২) "Indian Art : Story of its discovery by Europe" by Harman Goes. Hindusthan Standard. Puja Annual—1959.

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, তাঁর সম্পাদিত 'হরিদেবের রচনাবলীতে' (১৩)। তিনি 'কুট্টন দেবর' শব্দের বাংলা অর্থ করেছেন, 'অপদেবতা।' স্বভাবে ইনি "উপদ্রব বিতাড়ক, নিরাপত্তাবিধায়ক এবং নৃত্য-গীতাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।" শ্রীমণ্ডল মহাশয় এই 'কুট্টন দেবরের আর একটি নামান্তর সংগ্রহ করে উল্লেখ করেছেন, "কুট্টিচ্চট্টন।" যার অর্থ ঐ 'অপদেবতা।'

কেরালা রাজ্যে এই 'কুট্টিচ্চট্টন' কে নিয়ে একটা উৎসবের চিত্র পাওয়া গেছে "The Illustrated Weekly of India" নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১৪)। শিল্পী তার রং তুলি নিয়ে উৎসবের দেবতাকে চিত্রিত করছে। উৎসবের দেবতা কুট্টিচ্চট্টনের এক প্রকাণ্ড সুন্দর ছবি উৎসবের অপেক্ষায় সজ্জিত। ছবির বর্ণনা,—

গলা পর্যন্ত বৃহদাকার মুণ্ড মূর্তি। চোখ, কান, নাক স্বাভাবিক; কিন্তু প্রকাণ্ড এবং সুন্দর। সুদীর্ঘ কালো রংয়ের গোঁফ জোড়াটি দেখার মত। অধর ওষ্ঠ টুক্ টুকে লাল। দাড়ির নীচে গালপাট্টার আভাষ আর তার নীচে লাল রংয়ের তেকোনা শোলার ফুলের মালার মত কী যেন ঝুলছে। কপালে ইংরেজী "U" অক্ষরের মত রক্তবর্ণ তিলক, মধ্যে গোলাকার লাল টিপ। মুখমণ্ডলটি লালাভ এবং অত্যন্ত পৌরুষ দৃপ্ত। মাথায় পাকানো রঙিন পাগড়ি, ওপরে তেকোনা ফুলের মত কী দিয়ে যেন সাজানো। চিত্রে দেখা যায়, সামনা সামনি দুটি মূর্তি এবং ওপরে নীচে দুটি। কোন সুবেশী যুবক শিল্পী মূর্তিটিকে রংয়ে রংয়ে রাঙিয়ে তুলছে। ছবিটির মাথায় লেখা আছে—"Therayattam : A Kerala festival"

আবার ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (11. October 1959. P. 24) উৎসবের দেবতারূপে ঐ রকম আর একটি চিত্র অংকিত আছে। তার তলায় লেখা আছে,—"Preparing for the festival" এই মূর্তিটি ঐ মূর্তির চেয়ে কিছু ভিন্নতর হলেও একই দেবতা; যেমন,—প্রকাণ্ড, সুন্দর এক সুদেহী পুরুষ সিংহাসনে সমাসীন। ভঙ্গিটি যেন পদ্মাসনে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। বাহু, মণিবন্ধে নানা অলংকারে সজ্জিত হাত দুখানি দুই জানুর ওপরে ন্যস্ত ও হাতের দুই তর্জনী (অঙ্গুলি) ওপর দিকে উঁচু করা। পশ্চাৎপটে কারুকার্যমণ্ডিত বিরাট একটা চালচিত্র। গোলাকার চোখ, ও মোচা গোঁফ এবং বিশেষ করে লম্বা মত গালপাট্টাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাথার বড় বড় চুল দুপাশে ছড়িয়ে আছে। পোষাকের মধ্যে বুকের আচ্ছাদনে বেশী কারুকার্য লক্ষ্য করা যায়। ছবিটি সাধারণ কালো কালিতে ছাপা (১৫)

(১৩) সাহিত্য প্রকাশিকা। ৪র্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। ভূমিকা ৭২৮ পৃঃ

(১৪) VOL NO LXXX. No. 38. Dated 20, September—1959. Sunday. P.33.

(১৫) 'রায় মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের মূর্তির আকৃতি গত বিশদ বর্ণনা কোথাও নেই। তবে তাঁর এ-মূর্তি কোথা থেকে এল? 'The Illustrated weekly of India' পত্রিকার উপরোক্ত দুটি সংখ্যায় চিত্রিত যে দুটি মূর্তি আছে, তার অনুকরণেই কি একদা দক্ষিণ রায়ের মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল? এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিসল মারী : মহীশূর রাজ্যে বিসলমারীর পূজা পদ্ধতি দেখে হোয়াইটহেড সাহেব মন্তব্য করেছেন যে, "The System as a whole is redolent of the soil and evidently belongs to a pastoral and agricultural community. The Village is the object for which it exists' (Pp 29,80,81 & 83)। শ্রীমণ্ডল মহাশয়ও তাই বলেছেন,—"কৃষি সম্পর্কের নিদর্শন। রুদ্র দেবতার নিকট অন্নভোগ উৎসবের একটি মূল্যবান চিত্র।" (১৩) বিসলমারী কিন্তু রুদ্র দেবতা নয়।

কিন্তু এই দেবতা পুরুষ, না স্ত্রী ? এখানে কিছু গোল আছে। পরিষ্কার আজ পর্যন্ত কেউ উত্তর দেন নি ; অথচ আমাদের তা পেতে হবে।

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে' প্রাগুক্ত হোয়াইটহেড সাহেবের ঐ গ্রন্থ (১১) থেকে এই বিসলমারী দেবতার বিষয় কিছু তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে 'বিসলমারী' বা 'বিসলমরী আম্মা' নামে এক শক্তিশালী গ্রাম্য দেবতা আছেন। 'মরী' অথবা 'মরী আম্মা' বাংলা দেশের চণ্ডী কথাটির মত দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রাম্য স্ত্রী দেবতার নামের পরেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ...দাক্ষিণাত্যে তাহা 'বিসলমরী' বলিয়া পরিচিত।" (১৬) ডঃ ভট্টাচার্যের ধারণা, "ধ্বনি তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রী দেবতা বোঝাতে 'বিসল> বিসলী> বিসুলী> বাসুলী (বড়ুচণ্ডীদাসের আরাধ্যা দেবী) নামে অপভ্রংশে পরিণত।" আকৃতির পরিচয়ে ইনিও বলেছেন যে," তাঁহার (বিসল মরী) অনেকটা নির্দিষ্ট গঠন পাওয়া যায়। প্রস্তরটি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্ধ দিকে উঠিয়াছে।" কিছু পরে তিনিই আবার বলেছেন "অতএব মনে হয়, বিসলমরীই বাংলার বাসুলী, বাসু আলী, দেবী বাসুলা নহেন।"

বাংলার বাসুলী দেবী না হোক, ডঃ শ্রীভট্টাচার্যের মতে, বিসলমরী স্ত্রী-দেবতা। এখানে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে! কেননা, লৌকিক দেবদেবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনেক পুরুষ দেবতা কালক্রমে স্ত্রী-দেবতায় পরিণত হ'য়ে গেছে। যেমন—মাকাল ঠাকুর পরে চণ্ডীদেবীর সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে মাকালচণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। (১৭)

তাছাড়া, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। যুগ্মমুণ্ড মূর্তির মধ্যে একটি পুরুষ দেবতা, নাম তার কুটুনদেবর ; তার গোঁফও আছে, গালপাট্টাও আছে। আর যে-মূর্তিটির গোঁফ নেই, সেটিই কি তাহলে স্ত্রী-দেবতা 'বিসলমারী ?' তাহলে এরও দাড়ির নীচে পুরুষের মত গালপাট্টা কেন ? স্ত্রী-দেবতার গালপাট্টা থাকা আদৌ কি সম্ভব ? কুমোরের

(১৬) বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য. ৪র্থ সংস্করণ—১৯৬৪ পৃঃ ৩৪৪।

(১৭) 'বাংলার লৌকিক দেবতা'—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। মাকাল ঠাকুর।

দ্বারা মূর্তির আকৃতিগত পরিবর্তন যতই ঘটুক, এসব মূর্তির নির্দিষ্ট কাঠামো কিন্তু যুগ যুগ ধরে অবিকৃতই রয়ে গেছে। গোঁফ আঁকা হয় রং তুলি দিয়ে, গালপাট্টার সরু উঁচু অংশটুকু থাকে কাঠের ছাঁচের মধ্যে; পটুয়ারা তা দিয়ে বংশ পরম্পরায় মূর্তি গড়ে চলে। অনুমান করবার মত সঙ্গত কারণ আছে যে, তন্ত্রের প্রভাব এদেশে যখন প্লাবন এনেছিল, সেই সময় পূর্বোক্ত খাঁড়ী মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারায়ণী গোঁপহীনা মুণ্ড মূর্তির মধ্যে রূপান্তরিতা হয়ে যান। কুমোরেরা একদিন গোঁফটা মুছে ফেলল; কিন্তু পুরুষ পরম্পরায় প্রাপ্ত কাঠের ছাঁচ থেকে গালপাট্টার অংশটুকু ভয়ে বা ভক্তিতে অথবা অজ্ঞাতসারে রয়ে গেল। মূর্তির মধ্যে মার্জিত রূপ দেবার জন্য এ কাজ তারা করে নি নিশ্চয়ই, তা হলে কোনটিরই গালপাট্টা আজ আর থাকতো না—অন্তত গোঁপহীন মূর্তিটির ত নয়ই। তাই আবার মনে হয়, 'বিসলমারী' আদি যুগে পুরুষ দেবতাই ছিলেন, কাল প্রভাবে সমাজের কোন কোন অংশে স্ত্রীদেবতায় পরিণত হন।

বারা ঠাকুরের এই 'বারা' শব্দটির উৎস সম্বন্ধে জানা গেছে যে এটি আর্যেতর ভাষা। সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো কুরকু প্রভৃতি আদিম জাতিদের ভাষায় 'বারেয়া' 'বারিয়া' ও 'বার' শব্দ আছে। যার অর্থ 'দুই।' (১৮) আবার কেউ বা বলেছেন, চারিদিক ঘেরা উচুঁ বেদী, ঘট, পানপাত্র, বৈদিক সোমপাত্র, তান্ত্রিক শ্রীপাত্র প্রভৃতি। শ্রীমণ্ডল মহাশয় তাঁর গ্রন্থে (১৩) উল্লেখ করেছেন, "ইহা যমজ দেবতার (Twin goods) প্রকৃষ্ট নিদর্শন...।" দুটি ঘটে পূজার অর্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয় বলেছেন যে"...এ-প্রথা খুব আদিম। দুটির মধ্যে একটি দেবতার প্রতীক (থিওলজিক্যাল ইমেজ) অপরটি দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রণালীর আধার (সেরিমনিয়াল কনটেনার) ছিল।" (১৭) সবাই প্রায় একমত যে, আর্যেতর শব্দ বারেয়া > বারিয়া > বারা, অপভ্রংশের মাধ্যমে এসে পৌচেছে।

এই মুণ্ড পূজা প্রথা আমাদের দেশে অভিনব কিছু নয়। সুদূর অতীতেও ছিল এবং আজও এই প্রথাকে বিভিন্নভাবে ও রূপে আমরা মেনে চলেছি। "হয়ত বা এর মূলে ছিল 'কালিকা পাতা' অথবা 'মড়াখেলা'। কোথাও শস্য বৃদ্ধিকামনায়, কোথাও শত্রু বিনাশের জয়োল্লাসে, কোথাও বা উৎপাত প্রতিরোধের জন্য, প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তার ফল-স্বরূপে মুকুটিত মুণ্ড, বহুমুণ্ড, নরপশুমুণ্ড (sphinx), ছাগমুণ্ড ইত্যাদি দেবতারূপে পূজিত হতো। আদিম যুগের 'চ্যাং'পূজা, নরবলি, শিরোব্রত, এই মুণ্ড পূজারই এক একটা রূপান্তর"। (১৩) আর পঞ্চমুণ্ডির আসনকে তো আমরা আজও কত না পবিত্র বলে মনে করি। এটি নতুন কিছু নয়, ভারতবর্ষের বিধানের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্য রূপ হ'তে ভাবে এবং ভাব হ'তে রূপেই তার আনাগোনা।

ফল কথা, এই বারাপূজার ধারা বাংলায় এসেছে কোন এক অজানা যুগে। দক্ষিণ ভারতের 'কুট্টন দেবর' বাংলায় এসে 'কুড়োন্ ঠাকুর' হয়ে গেছেন। আর 'বিসলমারী'

(১৮) A Santhali Dictionary by P.O. Bodding Vol-1 Part-I

নানারূপে রূপান্তরিত বা রূপান্তরিতা। 'কুটুনদেবের' কাজ হলো, ইনি আমাদের জীবনের নানাবিধ আধিভৌতিক উপদ্রব বিতাড়ন করে নিরাপত্তার বিধান করবেন, আর আমাদের নাচ-গানের অনুষ্ঠানগুলি তাঁর আশীর্বাদে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠবে। বিসলমারী দেব বা দেবীর কৃপায় আমাদের শস্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে ভরে উঠবে।

এই ২৪ পরগণার বুক চিরে প্রবাহিত আদি গঙ্গার বুকে একদা শুধু পণ্য সম্ভারই নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সুদূর রাজ্য থেকে এসেছে ও গেছে এবং যা এসেছে, তা' বাংলার শ্যামলিমায় মিশে গিয়ে একাকারে চির নবীন হয়ে আছে। হারীতি, শীতলাম্মা প্রভৃতি বহু অ-বাঙ্গালী দেবদেবীকে বাঙালী নামে ডেকে আমরা যেমন করে ঘরে তুলেছি তেমনি, 'এযাবৎ অজ্ঞাত-কুল-শীল' এই দেবতা দুটিকেও যেন সমান আদরে যথার্থ পরিচয়ে বরণ করে নিতে পারি। আর্য, দ্রাবিড়, কোল, কিরাত প্রভৃতি গোষ্ঠীর অথবা শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্মাশ্রিত জনসমাজের সীমিত স্বাতন্ত্র্য এই ভাব-সাম্যের ক্ষেত্রে উবে গিয়ে বিস্ময়কর একটা ঐক্য লাভ করেছে এবং আজও তার প্রবল গতি অব্যাহত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসবে সভাপতির ভাষণ

ডঃ সুকুমার সেন

দীর্ঘকাল সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সানন্দে যুক্ত থেকে একদা সেই যোগ বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল। সে কিছু দুঃখের কাহিনী। সে কাহিনী পরিষদের বর্তমান হীনাবস্থার ইতিহাসের পক্ষে অবান্তর নয়। আপনারা আজ পরিষদে নূতন জীবন সঞ্চার করতে উদ্যত হয়ে সমাগত হয়েছেন। সে কাহিনী আজ আপনাদের শোনানো আবশ্যক বোধ করি।

এম-এ পাশ করে গবেষণায় রত আছি। আমার শিক্ষাগুরু সুনীতিবাবু একদিন আমাকে বললেন সাহিত্য পরিষদের সভ্য হতে আর পরিষদের মাসিক সভায় আমার গবেষণার বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে আমি অচিরে সাহিত্য পরিষদের সভ্য হলুম এবং লিখলুম। আমার প্রথম প্রবন্ধ 'আর্য ভাষায় গদ্যের ভঙ্গী' তেমন সুবিধার হয়নি। তবে বৈদিক ভাষার উপর গুরুগম্ভীর লেখা বলেই তা সাদরে ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখলুম আমার তখনকার বিশেষ গবেষণার বস্তু নিয়ে—'বাংলার নারীর ভাষা'। যে অধিবেশনে প্রবন্ধটি পড়া হল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি চুণীলাল বসু মহাশয়। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার। সভাপতির অভিভাষণে তিনি আমার প্রবন্ধের এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যে আমার লজ্জা করতে লাগল। তেমন প্রশংসার নগদ বিদায় আমি আর কখনো কোথাও পাই নি। সেই অধিবেশনের স্মৃতি আমাকে মানসিক পাথেয় যুগিয়ে এসেছিল আমার গবেষণা কর্মে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের চর্চায় আমি গোড়া থেকেই সাহিত্য পরিষদের কাছে ঋণী। সাহিত্য পরিষদের পুথি অনেক রসদ যুগিয়েছে আমার লেখনীকে। সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ সর্বদা তৎপরতার সহিত আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তখন পরিষদের কর্ণধার ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বড় খুঁতে। তাঁর প্রশংসা পাওয়া সহজ সাধ্য ছিল না। তিনি আমার প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য করেছিলেন তাঁর বোধ করি শেষ সভাপতির অভিভাষণে।

এত কথা যে বললুম ভাববেন না তা কেবল আত্মপ্রশংসায়। শুধু এই কথা জানাবার জন্য বললুম যে আমার কাজের যেটুকু মূল্য আছে সে মূল্যের কিছু অংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাপ্য, এবং পরিষৎ আমার অন্যতম বিদ্যাধাত্রী।

—৮

শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানের কিছুকাল পরেই মনে পড়ছে না সঙ্গে সঙ্গে কিনা পরিষদের কর্তৃত্ব এমন এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে চলে গেল যাঁরা আসলে 'জার্ণালিষ্ট', অবসর সময়ে গবেষক। তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র উনবিংশ শতাব্দী সুতরাং তাঁদের নির্ভর ছিল ছাপা বই কাগজের উপর। উনবিংশতাব্দীর বাইরে গেলে পুথি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে হত। সেদিকে তাঁদের প্রবৃত্তি ছিল না বরং নিবৃত্তিই ছিল। তাঁরা কর্তা হয়ে গদিতে বসে পুরানো পুথি প্রকাশের সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ করে দিলেন, পরিষৎ প্রকাশিত সমস্ত পুরানো গ্রন্থের ষ্টক ওজনদরে বাজে কাগজের মত বেচে দিয়ে। এতে পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অনুমান করা দুরূহ নয়। পরীক্ষায় পাঠ্য আছে অতএব অর্থাগম কিছু হয় বলে দুখানি বই এঁরা দয়া করে ছাপতে লাগলেন।— বৌদ্ধ গান ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। তাঁরা সাহিত্য পরিষদ্‌কে ছাপা বইয়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশ ভবনে পরিণত করলেন। আর কেউ যে ছাপা বই নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আলোচনা করে তা তাঁদের মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। এমন এঁরা যখন ক্ষমতায় এলেন তখন আমি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনায় রত। একদিন এমন একখানি বই দেখার দরকার ঘটল যে বই অন্যত্র কোথাও নেই। পরিষদ্ মন্দিরে এসে বইটি দেখতে চাইলুম। আমাকে বলা হল, বার করে রাখব কাল আসবেন। পরের দিন গেলুম। কর্মচারী মুখ কাঁচু-মাচু করে বললেন, অমুকবাবু বলেছেন ও বই কাউকে দেখতে দেওয়া হবে না। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলুম, অমুকবাবুকে বলবেন সাহিত্য পরিষৎ বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের অধিকার ভুক্ত সম্পত্তি, অমুকবাবুর পৈতৃক অথবা স্বোপার্জিত জমিদারি নয়, আমি কাল এই সময়ে আসব, বই আমাকে দেখান চাই-ই। বলা বাহুল্য পরের দিন বইটি আমাকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল।

ক্রোধ প্রশমিত হবার পর দুঃখ জাগল। এমন করে লাঠালাঠি করা কি ভালো। সাহিত্য পরিষৎ মণি বিভূষিত হলেও আমার কাছে কালসর্প অধ্যুষিত সুতরাং ভয়ঙ্কর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। পরের দিনই আমি পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে চিঠি দিলাম।

এঁদের এবং এঁদের অনুগতদের অধিকার ভুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নানা দিকে দুর্গতি শুরু হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেশের অর্থব্যবস্থায় বিপর্যয় আনলে। স্বাধীনতা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তবৃত্তিকে উদারতর তো করেই নি উপরন্তু সঙ্কীর্ণতর ও স্বার্থপর করে দিয়েছে। তাই সাহিত্য পরিষদের উপর শিক্ষিত বাঙালীর উদাসীনতা বেড়েছে, মমত্বের চিহ্নও অবলুপ্ত প্রায়।

আমি সাহিত্য পরিষদের কাছেই থাকি। পথে আসতে যেতে পরিষৎ মন্দিরের ম্লানমুখ চোখে পড়ে। তখন প্রায়ই ভাবি মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের দিনের কথা। মন্দিরে মধ্যে স্থান না পেয়ে বহু ব্যক্তি মন্দির বাহিরে ভিড় জমিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে

ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই উচ্ছ্বসিত উৎসাহের দিনটির কল্পনা-ছবি মনে ভেসে উঠে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙালীর আদি অকৃত্রিম এবং একমাত্র সম্পূর্ণ জাতীয় বিদ্যা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠান। দেশের সব অঞ্চল থেকে শ্রদ্ধাশীল শিক্ষিত বাঙালী তাঁদের সযত্ন সঞ্চিত মূল্যবান পুথিপত্র, পুস্তক, প্রত্নবস্তু, মুদ্রা—এমন কি লক্ষ্মীর মোহরও চিরকালের রক্ষণের জন্যে ভবিষ্যতের বাঙালীর চিত্তকে পিতৃপিতামহের পদচিহ্নাঙ্কিত সেই কল্যাণের ট্রাডিশনের পথে এগিয়ে যাবার ভরসা যোগাবে, সেই উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে গচ্ছিত রেখেছিলেন। আমরা সকলেই এই সঞ্চিত মণি ভাণ্ডারের রক্ষার জন্য দায়ী। এ দায় শিক্ষিত বাঙালী একক এবং সমবেতভাবে কতটা বহন করেছেন সে হিসাব নিতেও হবে তার চেয়েও বড় কথা এখনও যা বিদ্যমান আছে তা সযত্নে ভবিষ্যতের জন্যে রক্ষা করতে হবে। দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং আরও অনেক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে কেন না কাল সর্বদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু বাঙালীর বাঙালিত্ব কখনও লুপ্ত হবে না। যেদিন হবে সেদিন বাঙালী জাত লোপ পাবে। সেদিন সাহিত্য পরিষদের প্রয়োজন থাকবে না।

এই যে অন্ধকারের কথা বললুম তা আশার আলো জেগেছে বলেই। শ্রীমান্ মদনমোহন কুমারের মত সহৃদয় উৎসাহী বাঙালীরা আজ সাহিত্য পরিষদের দুর্দশা মোচনে অগ্রসর হয়েছেন। অনেক আবর্জনা সরাতে হলে অনেক ধুলা উড়বে। আশা করি তাতে তাঁদের শ্বাসরুদ্ধ হবে না। জ্ঞানের এই প্রদীপটি তাঁরা উজ্জ্বল করবেন এই আশা করি। শেষে বলি "সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্।"

(৮. ৪. ১৩৭৯)

পরিষৎ-সংবাদ

প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৪ আষাঢ় '৭৯ শনিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ৭৯তম বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে স্বর্গত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও ভেরা নভিকোভার স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলেন যে চিন্তাহরণ বাবুর পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। তাঁহার মতো চিন্তাশীল গবেষক বর্তমানে দুর্লভ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুরাগিণী রাশিয়ার শ্রীমতী নভিকোভার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রীমতী নভিকোভার যে ঐকান্তিক অনুরাগ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন তা প্রায় দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর শ্রীমতী নভিকোভার গবেষণাও মূল্যবান। শ্রীগোপাল হালদার ভেরা নভিকোভার জীবনও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করিয়া তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করেন।

পরে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী নভিকোভার সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক স্মৃতিতর্পন করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এবং শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

৮ শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পরিষদ্-মন্দিরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এবং ডক্টর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, কোনো জাতি সংস্কৃতি বিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যে সাহিত্য-পরিষদ্ সেই সংস্কৃতিকে ধরিয়া রাখার এবং অগ্রসর করিয়া দিবার সংকল্প একদা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন বিস্মৃত প্রায়। বহু মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সারস্বত মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে উজ্জীবিত করিবার ভার বর্তমান বাঙালী জাতির। সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার সঙ্গে পরিষদের সংস্রব কিভাবে কিছুকালের জন্য ছিন্ন হইয়াছিল দুঃখের সঙ্গে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি এ আশাও পোষণ করেন যে পরিষদের বর্তমান কর্ণধারদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরিষদ্ তার লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া পাইবে। অতঃপর শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস রামমোহন গবেষণায় নতুন তথ্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য পূর্ণ আলোচনা করেন।

পরিষদ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার বাঙালী মাত্রকেই আহ্বান জানাইয়া

বলেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষীদের কঠোর পরিশ্রমে যে সাহিত্য পরিষদ্ একদিন ভারতের মধ্যে বিশেষ স্থান করিয়া লইয়াছিল তাহাকে জীবন্ত রাখিবার ভার সকলকেই লইতে হইবে। নিঃস্বার্থ কর্মীর আজ একান্ত অভাব। সেই অভাব মোচনের জন্য বিদ্যার্থী যুব সমাজকে অগ্রণী হইবার জন্য তিনি আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে সম্পাদকের নিকট লিখিত কয়েকটি শুভেচ্ছা বাণী পরিষদ সম্পাদক কর্তৃক সভায় পঠিত হয়। এই বাণীগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল—:

২ বেলতলা রোড্
কলিকাতা
৮ই শ্রাবণ ১৩৭৯

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবের আমন্ত্রণলিপি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। এই স্মরণীয় উৎসবে যোগদানের ইচ্ছা সত্বেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি উৎসব-সভায় উপস্থিত থাকতে পারলাম না।

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সাহিত্য ও গান। সাহিত্য-পরিষদ দীর্ঘ আশী বছর ধরে বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য, সঙ্গীত ও পুরাকীর্তিকে উদ্ধার ক'রে প্রকাশ করেছে, পূর্বপুরুষের সৃষ্টিকে রক্ষা করেছে। বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙলার সাহিত্য, বাঙলার সংস্কৃতি সাহিত্য পরিষদের মধ্য দিয়ে পূর্ণ বিকশিত হোক। সাহিত্য পরিষদের সেবায় তোমরা সাফল্য মণ্ডিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
(স্বাঃ) অপর্ণা রায়

৬ সি মিডিলটন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৯

তোমার ১লা শ্রাবণের পত্র পেয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী ৮ই শ্রাবণ পালিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হ'লাম। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান সমূহের সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছান্তে,

(স্বাঃ) প্রফুল্লচন্দ্র সেন

বিশ্ব-ভারতী
শান্তিনিকেতন

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসের আমন্ত্রণপত্র পেয়েছি। উৎসবে যোগদান করতে পারলে আনন্দিত হতাম। কিন্তু সেদিন আমার পক্ষে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আশা করি আমাকে মার্জনা করবেন। ইতি—

(স্বাঃ) প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
(উপাচার্য-বিশ্বভারতী)

১নং বালিগঞ্জ টেরেস
কলিকাতা-১৯

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম জন্মোৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার শারীরিক অবস্থা এমন নয় যে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারি। বাঙালীর নিজস্ব এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের উৎসবে দূর থেকে সর্বাঙ্গীন সাফল্য প্রার্থনা করছি।

বিনীত
(স্বাঃ) হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভূতপূর্ব উপাচার্য-রবীন্দ্রভারতী)

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে জনসাধারণ কর্তৃক উপহৃত গ্রন্থ চিত্র প্রভৃতির একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান সভার সভাপতি ডক্টর সেন। নিম্ন বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ও ভদ্র মহোদয়গণ পুস্তক উপহার দান করেন :—

(১) মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ;
(২) গ্রন্থ বিতান—৯।৪ টেমার লেন, কলিঃ-৯ ;
(৩) কথা-কলি—৯।৩ টেমার লেন, কলিঃ-৯ ;
(৪) দেবকুমার বসু/অবধায়ক-বিশ্বজ্ঞান-৯/৩ টেমার লেন, কলি-৯ ;
(৫) দীপায়ণ-১৮/এ টেমার লেন, কলি-৯ ;
(৬) অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির—৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্-কলি-১২ ;
(৭) ইন্‌ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং-৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিঃ ৭
(৮) আনন্দ ধারা প্রকাশন—৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্-কলি-১২ ;
(৯) বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস—৫/১ এ কলেজ রো, কলি-৯ ;
(১০) বিদ্যাভবন—৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড-কলিঃ-৯ ;
(১১) এ, মুখার্জি এণ্ড কোঃ—২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট-কলিঃ-১২ ;
(১২) শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—কলিকাতা ৫৫ ;

(১৩) এ. কে. সরকার এণ্ড কোং—১১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্-কলিঃ-১২ ;
(১৪) বিশ্ববাণী প্রকাশণী—৭৯।১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড্ কলি-৯ ;
(১৫) জিজ্ঞাসা—১ কলেজ রো, কলি-৯ ;
(১৬) ইস্টার্ণ পাব্লিশার্স—৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্, কলি-৯ ;
(১৭) শ্রীচণ্ডী দাস চট্টোপাধ্যায়—
(১৮) শ্রীমদনমোহন কুমার—কলিঃ-৬
(১৯) শ্রীরতিরঞ্জন মণ্ডল, কানপুর কুমুড়সা, হুগলী
(২০) শ্রীসোমেন পাল/তপেন্দ্র স্মৃতি আসর, কলিঃ-১৪
(২১) শ্রীদিলীপকুমার সাহা, কলিঃ ৫৪
(২২) শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য c/o বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিঃ ৬
(২৩) সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ,
(২৪) শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, সাধারণসম্পাদক 'ইণ্ডিয়ান্ ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেস'
(২৫) শ্রীমতী রেণুকা রায় ;
(২৬) সারস্বত লাইব্রেরী, ৪০৬ বিধান সরণী, কলিঃ-৬
(২৭) সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২৩
(২৮) শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার
(২৯) শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, ৫২ মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিঃ-৯
(৩০) শ্রীঅশোক উপাধ্যায়,
(৩১) ডঃ সরোজমোহন মিত্র
(৩২) শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য
(৩৩) শ্রীকামিনী কুমার রায়

এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী উমা পাল কর্তৃক নিম্নলিখিত মহাপুরুষগণের চিত্র উপহৃত হইয়াছে :—
১। মহাত্মা গান্ধী ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩। জগদীশচন্দ্র বসু ৪। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৫। চিত্তরঞ্জন দাশ ৬। সুভাষচন্দ্র বসু ৭। শ্রীঅরবিন্দ ৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী ও অরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট (২৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৯) সকাল ৮টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী এবং অরবিন্দ জন্ম শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ সভার অনুষ্ঠান হয়। সকাল আটটায় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়। পরে পরিষদের রমেশভবনে'র সভাকক্ষে শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনাসভার অনুষ্ঠান হয়। সভার প্রারম্ভিক ভাষণে পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক

মদনমোহন কুমার "স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী" ও অরবিন্দ জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। অরবিন্দ জীবন ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের ডি. পি-আই-অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এবং সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়। সভাশেষে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা অরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে ১লা ভাদ্র, ১৩৭৯ (১৮ই আগষ্ট ১৯৭২) তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে অরবিন্দ জন্ম শতবর্ষে এই সভার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ" প্রসঙ্গে ভাষণ প্রদান করেন। এই দুই ঋষি ও মনস্বীর জীবন ও দর্শনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের দিকটির প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কেবলমাত্র স্বদেশ সাধনা নয়—ধর্ম্ম-দর্শন সাহিত্য—ভারতসাধনার প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই দুই দিকপাল ভারতপথিকের অবদান তিনি পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। সি. এফ. এণ্ডরুজ ও রোমাঁ রোঁলার ধারণা রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যসাধনায় শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব সক্রিয় ছিল—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নূতন তথ্যের দিকটি রবীন্দ্র গবেষকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।

অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী মহাশয় 'শ্রীঅরবিন্দের দর্শন' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে মূলগত পার্থক্যের কথা বলেন। তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ও সত্যদর্শন ভারতীয় দর্শনের মূলকথা—এই প্রেক্ষিতে অরবিন্দ দর্শনের স্বাতন্ত্র্যের দিকটি তিনি ললিত ভাষায় বিবৃত করেন। চৈতন্যসত্তা দিয়া শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় দর্শনের নব-ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। শঙ্করাচার্য জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ এই মতের সমর্থক ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের মতে চৈতন্যের সঙ্গে জগতের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সুতরাং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জগৎ মিথ্যা তত্ত্বকে অরবিন্দ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ বেদ উপনিষদ এবং সায়নাচার্য প্রভৃতির টীকাগুলিকে গ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহার দর্শন-চিন্তায় ইহাদের প্রভাব থাকিলেও টীকাকারদের ব্যাখ্যার আদর্শ তিনি পরিহার করেন। সুতরাং অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে তাঁহার চিন্তা নবমূল্যে তাৎপর্য মণ্ডিত। শ্রীঅরবিন্দের লব্ধ সত্য হইতে অবগত হওয়া

যায় যে মনের উপরেও আছে একটি অতি-মানস স্তর। অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জীবনের প্রকাশ, সেই প্রকাশের পথে আসিয়াছে মন—এই অভিব্যক্তির পথেই আমরা একদিন অতিমানসস্তরে উপনীত হইতে পারিব। এই নব নব রূপান্তর শ্রীঅরবিন্দের অভিব্যক্তির নির্দেশ।

অধ্যাপক চক্রবর্তী অরবিন্দ-দর্শনের ব্যাখ্যা প্রদানকালে আশা প্রকাশ করেন যে শ্রীঅরবিন্দদের প্রদর্শিত পথে আগামীকালের ভারতবর্ষে নবযুগের অভ্যুদয় ঘটিবে।

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দোপাধ্যায় "শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন।

সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে শতবর্ষের আলোকে শ্রীঅরবিন্দদের জীবনদর্শন ও সাহিত্য ভাবনার বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী চামেলী ঘোষ।

কলিকাতা শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু সভাশেষে সভাপতি মহাশয়-অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব

২৮শে ভাদ্র শনিবার ১৩৭৯ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাকক্ষ রমেশ ভবনে 'পথের পাঁচালী'-র অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টসপ্ততিতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন। সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত এই মনোজ্ঞ সভায় বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সুধী ও সাহিত্য অনুরাগীবৃন্দদের সমাবেশ হয়। বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু, বনফুল, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীসুমথনাথ ঘোষ এবং কবি ও সমালোচক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের অনবদ্য ভাষণে কেবলমাত্র বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ জীবনকথাই নয়—বাংলা-সাহিত্য সেবায় তাঁর স্বকীয়তা ও মৌলিকত্বের দিকটিও পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। বনফুল, বিভূতিভূষণের উদ্দেশ্যে স্বরচিত দু'টি কবিতা পাঠ করিয়া সভার আনন্দবর্দ্ধন করেন। সভাপতি ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর ভাষণে বলেন—'বিভূতিভূষণের মনটি ছিল শিশুর মত। তাঁর সাহিত্যের লক্ষণীয় দিক—কিশোরসুলভ কৌতূহল-সারল্য-আনন্দ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন মাটির কাছাকাছি মানুষ। নদী প্রবাহের মত তাঁর সাহিত্য—তাঁর রচনা আগামী কালের পাঠক সমাজকে আনন্দদান করবে—তাঁদের সাহিত্য রস-পিপাসাকে চরিতার্থ করে তুলবে।' পরিষদের চিত্রশালায় বিভূতিভূষণের একখানি তৈলচিত্র স্থাপন-বিষয়ক শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদ্ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার অনুষ্ঠান সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, সমবেত সজ্জন ও সুধীবৃন্দকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

—৯

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর স্মৃতি-সভা

১১ কার্তিক, শনিবার, ১৩৭৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাকক্ষে পরলোকগত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর স্মৃতি-সভা উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। বিংশ-শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষে জ্ঞান-মনীষা ও বিজ্ঞানচর্চায় অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিব ও অনুরক্ত শিষ্য হিসাবে অধ্যাপক বসু ভারতবর্ষের জনজীবনে সুমহান্ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে অধ্যাপক বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

পরিষদে অনুষ্ঠিত এই সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনকালে শ্রীশৈবাল গুপ্ত অধ্যাপক বসুর অন্তরঙ্গ জীবনকথা পরিবেশন করেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগাযোগের দিকটি শ্রীগুপ্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করেন। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় অধ্যাপক বসুর সমৃদ্ধ সারস্বত অবদানের দিকটি পরিস্ফুট করেন। স্বাদেশিকতা, মানবিকতা ও গান্ধী জীবন দর্শনের প্রচারে তিনি অধ্যাপক বসুর সুমহান নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেন। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য নৃতাত্ত্বিক, পুরাতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও গান্ধীবাদী অধ্যাপক বসুর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করেন। Man in India র সম্পাদক ও নৃতাত্ত্বিকরূপে নির্মলকুমার বসু প্রায়-বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছিলেন—এই মনস্বী বাঙালীর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে দেশবাসী অগ্রগামী হবেন বলিয়া তিনি আশাপ্রকাশ করেন। শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত অধ্যাপক বসুর বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা ও তাঁহার গ্রন্থ ও রচনাদি প্রকাশের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞানী-অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সারস্বতচর্চার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্বের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়া দুঃখের সঙ্গে বলেন—তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল অচিরকাল মধ্যে তাহা পরিপূরিত হইবে না। পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার কর্তৃক উপস্থাপিত একটি 'শোক-প্রস্তাব' সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তাহা অধ্যাপক বসুর শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গের সমীপে প্রেরিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর অনুরাগী, ভক্ত ও বিদ্বজ্জনের এই সভাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য পরিষদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর শ্রীভবতোষ দত্ত।

কবি শশাঙ্কমোহন সেনের জন্ম শতবার্ষিকী

৮ পৌষ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ শনিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে, কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

শশাঙ্কমোহন সেন সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে একটি প্রায় বিস্মৃত নাম। তাঁহার রচিত কবিতা পুস্তক, সমালোচনা ও নিবন্ধ গ্রন্থ সমূহ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। সাম্প্রতিক ছাত্র-শিক্ষক ও সাহিত্যানুরাগী মহলে শশাঙ্কমোহনও উপেক্ষিত। বিগতযুগের এই প্রসিদ্ধ বাণী-সেবকের স্মৃতি-তর্পণকালে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলি নিবেদন করেন। শ্রীভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে শশাঙ্কমোহনের জীবন ও সারস্বত সাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রযুগেও শশাঙ্কমোহন ছিলেন স্বতন্ত্র পথের কবি। তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম কবি-সমালোচক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গঠন-পঠনে শশাঙ্কমোহন একটি স্মরণীয় নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম. এ. প্রবর্তনে তিনি পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ ও আচার্য দীনেশচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার "বঙ্গবাণী" "বাণীমন্দির ও "মধুসূদন" বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ঐশ্বর্য। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির রুচি বদল ও ঋতু বদলের এই ক্রান্তিলগ্নে শশাঙ্কমোহনের মত সারস্বত সাধকের সাহিত্যকীর্তির পর্য্যালোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া তিনি মনে করেন।

এই স্মৃতি সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক শ্রীশচীন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন, শ্রীসুধীর কুমার বসু এবং শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত। অধ্যাপক শ্রীত্রিদিনাথ রায় সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে শশাঙ্কমোহনের পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের স্মৃতিচারণা করেন। শশাঙ্কমোহনের গ্রন্থাদির পুনর্মুদ্রণ এবং তাঁহার জীবনচরিত রচনার কাজে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই অগ্রণী হইবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার পরিষদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর জন্ম শতবার্ষিকী

৭ই মাঘ রবিবার (২২শে জানুয়ারী) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর জন্ম শত বার্ষিকী পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক শ্রীত্রিদিব নাথ রায়।

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য—কবির জীবন কাহিনী আলোচনা করার পর তাঁহার কাব্য সাধনা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—রবীন্দ্রনাথের কালের কবি হইয়াও তাঁহার কাব্য-কৃতির বৈশিষ্ট্য সহজেই আকর্ষণীয়। প্রকাশ ভঙ্গীতে কোন কোন ক্ষেত্রে কবি ভুজঙ্গধর সাহিত্যে এক বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত র খিয়াছেন। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ভুজঙ্গধরের কাব্যের দার্শনিকতা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার কবিকৃতির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর কাব্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভান্তে শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্মৃতি-তর্পণ

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯০০-১৯৭২ খ্রীঃ)

বিংশ শতকের বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়ে যে সব বাঙালী জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও মনীষায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে' মাসে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া। বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভাষ্যকার মধুসূদন সরস্বতী তাঁর কুশাগ্রতীক্ষ্ণ দিব্য প্রতিভার দ্বারা যে বংশকে ইতিহাসে অম্লান করে গেছেন—চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর জন্ম সেই প্রসিদ্ধ বংশে। পিতৃদেব—জ্ঞানদাকণ্ঠ চক্রবর্তী।

আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী আবাল্য মেধাবী ছাত্র। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম-যজন-যাজনে পিতৃদেব জ্ঞানদাকণ্ঠের আস্থা ছিল। অনুরাগ ছিল সংস্কৃত-সংস্কৃতিতে। তদুপরি কোটালিপাড়ার এই ব্রাহ্মণবংশে বহু কীর্তিমান সংস্কৃত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। কোলকাতা সংস্কৃত স্কুলে তিনি প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি এই স্কুল থেকে আট টাকা বৃত্তি পেতেন। কিন্তু সংস্কৃত স্কুলে গণিত শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য সংস্কৃত স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন হল না। গণিত অধ্যয়নের জন্য তিনি অতঃপর সেন্টপলস্ স্কুলে যোগদান করেন। এখান থেকে তিনি অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য তিনি প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভে বঞ্চিত হলেন। গণিতকে পাঠ্য সমূহের অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের আশা তিরোহিত হ'ল। তিনি 'সেন্ট পলস্ কলেজে' অধ্যয়ন করতে লাগলেন। ১৯২১ সালে এই কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি সিটি কলেজে সংস্কৃতে অনার্স অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে সিটি কলেজের ছাত্ররূপে তিনি বি. এ. সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ ১ সংস্কৃত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরে ১৯৩০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষাসূত্রে চক্রবর্তী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণপদক ছাড়াও, শ্রীনাথ কুণ্ডু সুবর্ণপদক, দুর্গামণি সুবর্ণপদক, অন্নপূর্ণা দেবী সুবর্ণপদক এবং প্রসন্নময়ী সুবর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর তাঁর অনুরাগ সুগভীর। জীবন ব্যাপী সাহিত্যকর্মে তাঁর এই সংস্কৃতানুরাগের দিকটা পরিস্ফুট। তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ও Bengal Sanskrit Association

পরিচালিত কাব্যতীর্থ উপাধি পরীক্ষাতেও অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এইরূপ বহু কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার মধ্যে তিনি ছাত্রব্রত সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবনে তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী। বিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। বর্তমান শতাব্দীর বঙ্গীয় শিক্ষক সমাজে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৯২৯ সালে তিনি 'বেথুন কলেজে' সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেকচারারের পদে যোগদান করেন। ১৯২৯-৪১ পর্যন্ত বেথুন কলেজে অধ্যাপনাসূত্রে তাঁকে নিযুক্ত থাকতে হয়। ১৯৩১ সালে 'সংস্কৃত ও বাংলার' লেকচারার রূপে অধ্যাপক চিন্তাহরণ কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪১-৫৫—প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি 'কৃষ্ণনগর কলেজে' বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শিক্ষক জীবনের শেষ স্মরণীয় দিনগুলি অতিবাহিত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে। ১৯৫৫-৫৮ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য' বিভাগের অধ্যাপকপদে বৃত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, Bengal Sanskrit Association, Assam Sanskrit Board. ঢাকা সারস্বত সমাজ, বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা পরিষদ, বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন (পঃ বঃ) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক রূপে শিক্ষাজগতে তিনি একজন সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। শিক্ষাবিভাগের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের সম্পাদক রূপে কিছুদিন কাজ করেন। শিক্ষা বিভাগে তাঁর এই সুদীর্ঘ কর্মজীবন কেবলমাত্র তাঁর জীবন ও জীবিকাকেই চরিতার্থ করেনি—আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পক্ষেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছিল।

পূর্বভারতের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতি বিশেষ করে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর মৌলিক অবদান ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে সুবিদিত।—তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনা ও অন্বেষণের বিষয় ছিল—বাঙালীর জীবনবোধ ও বোধি, জ্ঞান ও প্রতীতি, মনন ও ধ্যান—এককথায় জাতির সার্বিক আত্মবীক্ষা। তাঁর চিন্তা ও ভাবনার বিষয় বিচিত্র মুখী। সাহিত্য-ভাষা—ব্যাকরণ-অভিধান-কোষগ্রন্থ-পুঁথি-তন্ত্র-হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম, পালি-প্রাকৃত-লোকসংস্কৃতিধর্ম-মূর্তিতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব-রাষ্ট্রনীতি-সমাজ-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে নূতন আলোকসম্পাত করে তিনি তাঁর সৃজনী চিত্তপ্রকর্ষের পরিচয় প্রদান করেন। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার পাবক স্পর্শে তরুণ চিন্তাহরণ নূতন ভারত আবিষ্কারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েন। গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ অপরিহার্য হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে– কারণ গুরুকরণ ব্যতীত কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। সেজন্যই তরুণ চিন্তাহরণ বর্তমান যুগের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ—পণ্ডিত ও চিন্তানায়ক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ অভিলাষী হয়ে পড়েন। তাঁর এই

আশা চরিতার্থ হতে বিলম্ব হোল না। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীপতি রায়চৌধুরী মহাশয় এই সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করিয়ে দেন। তদবধি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আচার্য চিন্তাহরণের সাহিত্যগুরু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়াও আর একজন মনস্বী কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর নবউদ্বুদ্ধ চেতনায় বারিনিষেক করেন, তাঁর জাগ্রত বক্ষপঞ্জরে জ্বালিয়ে দেন দীপশলাকা। চিন্তাহরণের গবেষক সত্ত্বা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।

এইশতকের তিরিশের দশকে আচার্য্য চিন্তাহরণ বঙ্গদেশ ও বহির্বঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এইসূত্রে, এশিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স প্রভৃতি ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্র বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলির কথা মনে পড়ে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আচার্য চক্রবর্তী মহাশয় একজন অগ্রগামী গবেষক, অধ্যবসায়ী সাহিত্যসাধক হিসাবে অচিরে এতদ্দেশীয় বিদ্বৎমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর সংস্রব জীবনব্যাপী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। ১৩৩১-৪১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সহকারী সম্পাদকরূপে পরিষদ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি পরিষদের পুঁথিশালা ও গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৩৪৫-৪৯. এবং ১৩৬৭-৭১ পর্যন্ত তিনি পরিষদের পুঁথিশালাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষের পদেও তিনি নির্বাচিত হন। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতির পদে উন্নীত হন। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকে জীবনান্ত পর্যন্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় ঐ একই পদে বৃত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের উপ-গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং ১৩৩১-৪০ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদকরূপে পরিষদের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করেন। 'ইণ্ডিয়ান কালচারাল কনফারেন্সে' অধ্যাপক চক্রবর্তী নানাগুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি ক্লাসিকাল সংস্কৃত শাখার সম্পাদক এবং ১৯৩৭ সালে বাংলা শাখার সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৭ সালে দিল্লী মহানগরীতে, 'অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সের' ঊনবিংশতিতম অধিবেশনে অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতশাখার সভাপতি ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, তাঁর মতে সারস্বত চর্চা ও জ্ঞান সাধনার পীঠভূমি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৬১-৬৪ পর্যন্ত তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ববিভাগের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চক্রবর্তী মহাশয় সোসাইটীর একজন 'ফেলো' নির্বাচিত হন। জানুয়ারী ১৯৬৫-হতে জানুয়ারী ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি এশিয়াটিকে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৬৫ সালে

বারাণসী ধামে অনুষ্ঠিত "তন্ত্রসম্মেলনে" তিনি তন্ত্রসংস্কৃতি বিভাগে সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পরিভাষা কো-অর্ডিনেটিং এ্যাণ্ড বেঙ্গলি স্পেলিং ষ্টাণ্ডার্ডিজেশন কমিটি' ও "বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের' স্পেশাল লাইব্রেরীজ্ কমিটির' সদস্যপদ লাভ করেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি বিশেষ কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেননি। তাঁর এই চর্চার ক্ষেত্র বহু পরিব্যাপ্ত এবং সাহিত্যে বহুচারিতাই বোধকরি তাঁর চরিত্রলক্ষণ। অভিধান ও কোষগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং আবশ্যকতার দিকটি তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিচার বিবেচনা করেছেন, এবিষয়ে তাঁর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অতিশয় মূল্যবান ও অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে। তিনি "বঙ্গীয় মহাকোষ' ও 'শ্রীভারতীর' সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পাঁচ খণ্ড 'ভারতকোষ' প্রকাশের প্রকল্পগ্রহণ করেছেন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই ভারতকোষের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বহুবিদগ্ধ বাঙালী পণ্ডিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদনা করে বাঙালীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তন সূচনা করেন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদকরূপে বাঙালীজীবনের বিচিত্র রহস্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠক সমাজকে কৌতূহলী করে তোলেন. তিনি ১৩৪৩-৪৪. ১৩৫০-৫৫, এবং ১৩৬৪-৬৫ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার' সম্পাদনার যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৯৩৩-১৯৭০ পর্যন্ত তিনি '.বথুন কলেজ ম্যাগাজিনের' সম্পাদক ছিলেন। মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই 'বেথুন ম্যাগাজিনের' গৌরব বৃদ্ধি হয়।

অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সাহিত্যকর্ম বিপুল। ছাত্রজীবনেই পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধাদি সমাদৃত হয়। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে, কার্ত্তিক বসু সম্পাদিত 'স্বাস্থ্য সমাচারে' তাঁর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রচনার নাম, 'কচুরী পানা,'। প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনার নাম—'বাংলা রামায়ণে রত্নাকরের উপাখ্যান"। ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় প্রচারিত বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর সমস্তই আজও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর এই সমস্ত রচনার সর্বাঙ্গীন পরিচয় প্রদান বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। তিনি যে সব পত্র পত্রিকায় লিখেছেন সেগুলির মধ্যে, Journal of the Asiatic Society, Yearly Review of the Asiatic Society, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Indian Historical Quarterly, Indian Antiquary, Indian Culture, Quarterly Journal of the Mythtic Socicty, Indian P. E. N., Man in India, Jaina Antiquary, Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Education Gazette, Modern Review, Calcutta Review, Amrita-Bazar Patrika, Folklore, Jaina Gazetteer, Nature, Islamic Culture, Kalyan Kalpataru, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রবাসী

ভারতবর্ষ, বসুমতী, হিতবাদী, তত্ত্ববোধিনী, আনন্দবাজার, দেশ, অমৃত, বেথুন কলেজ ম্যাগাজিন, কৃষ্ণনগর কলেজ ম্যাগাজিন, পঞ্চপুষ্প, নবশক্তি, প্রণব, বিশ্ববাণী, উদ্বোধন, জীনবাণী, স্বাস্থ্য সমাচার, দ্বন্দ্ব, কালপুরুষ, সমকালীন, সোনার বাঙলা, সন্দেশ, শিশুসাথী, হোমশিখা, কল্যাণী, কায়স্থসমাজ, বৈদিক, শনিবারের চিঠি, শতদল, অর্চনা, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহু দুর্লভ স্মারক গ্রন্থ ও অখ্যাত পত্র পত্রিকাতেও তাঁর বহুমূল্যবান রচনা বিধৃত আছে।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিকা :—

(১) জৈন পদ্মপুরাণ (১৯২৪)

(২) পবনদূত ধোয়ী, সম্পা : (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯২৬)

(৩) মনোদূত-বিষ্ণুদাস, সম্পা : (স: স: প: ১৯৩৭)

(৪) কালিকামঙ্গল, বলরাম কবিশেখর, সম্পা : (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৩১)

(৫) Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Vangiya Sahitya Parisat (1935)

(৬) বাংলা পুঁথির বিবরণ, ১ম ভাগ (ব. সা. প) (১৯৪১)

(৭) সতরঞ্চ কৌতুহল, (সং. সা, প, ১৯৪৮)

(৮) Descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol VIII (1940)

(৯) Descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Royal Asiatic Society of Bengal. Vol XIV (1955)

(১০) বাংলার পাল পার্বন (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৯৫২)

(১১) তন্ত্র কথা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) (১৯৫৫)

(১২) ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৬০)

(১৩) Tantras : Studies on their Religion and literature (1963)

(১৪) কাদম্বরী (তারাশঙ্কর-১৯৬৩) সম্পা :

(১৫) Krishnanagar College Centenary Commemoration Vol. Ed. 1948.

(১৬) Sundarananda Kavya Ed. (Bib, Ind. Series)

(১৭) Dharmabindu Ed. (Bib. Ind. Series)

(১৮) Rkpratisakhyam of Saunaka (S.S.P. Series) Ed.

(১৯) Tararahasyavrittika of Lakshmana Desika (Asutosh Sanskrit Series) Ed.

(২০) ব্যাকরণ কৌমুদী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পা:, (?)

(২১) বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ (সাহিত্য সাধক চরিত মালা (১৯৭১)

(২২) হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান (১৯৭০)

(২৩) Glimpses of Indian Culture, Religion etc. (In the Press)

আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য সাধনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি পুঁথি-ভাষা-কোষগ্রন্থ-অভিধান-ব্যাকরণ-ইতিহাস প্রভৃতি নিয়ে জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জগতে আচার্য চিন্তাহরণের অবদান অসামান্য। দেশ বিদেশের বিদ্বৎজনসমাজে তাঁর পাণ্ডিত্য সমাদর লাভ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় তিনি সুদূর প্রসারী আলোক-সম্পাত করলেও পুঁথিচর্চাই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর আচার্য চিন্তাহরণ হরপ্রসাদের পদাভিষিক্ত হন। অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি পুঁথি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহিত্য সাধক জীবনে এ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে পদ অলঙ্কৃত করে পুঁথিচর্চায় যুগান্তর আনয়ন করেন—আচার্য চিন্তাহরণ সে ঐতিহ্যকে অম্লান রাখেন। এ কম গৌরবের কথা নয়। পুঁথিচর্চা বিষয়ক তাঁর ইংরেজী বাংলা নিবন্ধগুলি এতৎ বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচারবোধের সূক্ষ্মতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসীতে' 'পুঁথির কথা' নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: "শতাধিক বৎসর যাবৎ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংগৃহীত ও প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ চলিয়া আসিতেছে। ফলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে—ভারতীয় সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মনীষীগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত নষ্টপ্রায় গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথির সাহায্যে 'মহাভারত' প্রভৃতির ন্যায় সুপরিচিত ও প্রক্ষিপ্ত অংশে ভারাক্রান্ত গ্রন্থের যথা সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেশের সমস্ত পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই—যে সকল পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদেরও সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা সম্যক আলোচনার যথোচিত সুব্যবস্থা হয় নাই। এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে—সত্বর যথাবিহিত ব্যবস্থা না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।" দেশের বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পুঁথিই বোধ করি সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর—অথচ পুঁথির মধ্যে দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের যত তথ্য লুক্কায়িত আছে—এত আর কোথাও নেই। দেশের সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুঁথির পাতা হতে অমূল্য তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। আচার্য চিন্তাহরণ জ্ঞানচর্চার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সূচনাতেই এই অতিশয় উপেক্ষিত অথচ মূল্যবান বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য চর্চার পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক ইতিপূর্বেও তা

উল্লেখ করেছি। তাঁর সারস্বত চর্চার এই বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে অন্য যেকটি বিষয় বিদ্বৎমণ্ডলীর সমাদর লাভ করেছে সেগুলির মধ্যে ভাষা-ব্যাকরণ-কোষগ্রন্থ ও অভিধানের বিষয় বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। তাঁর 'ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে এতৎবিষয়ক যে সমস্ত নিবন্ধমালা সংকলিত হয়েছে সেগুলির মধ্যেই এসব বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তার দিকটি উদ্ভাসিত। এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই যেন একটি গবেষণাযোগ্য বিষয়ের পটভূমিকা, সংকলিত নিবন্ধগুলির প্রত্যেকটিই অধ্যবসায় সাপেক্ষ গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আচার্য চিন্তাহরণের ভাষা-ব্যাকরণ-সাহিত্য সংস্কৃতি-বিষয়ক ঐ প্রস্তাবগুলিকে অবলম্বন করে পরিপূর্ণ বাণীরূপ দেওয়ার কাজে আজও কেউ এগিয়ে আসেননি।

তন্ত্র-সাহিত্যের চর্চায় চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর দান সুবিদিত। তন্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁর নিবন্ধ ও প্রবন্ধগুলি আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। পুঁথির আলোচনা সূত্রে তিনি তন্ত্র বিষয়ক বহু অজ্ঞাত তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান আমাদের জ্ঞানগোচর করেছেন।

লোকধর্ম, লোকসাহিত্য ও লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাপূর্ণ নিবন্ধরাজি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রাখবে। সাম্প্রতিককালে লোকায়ত সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। লোকসাহিত্যচর্চার এই বন্যাবেগ সূচনার অনেক আগে তিনি এই বিষয়টির প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লোকায়ত বাংলার আবিষ্কারের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবেন। বাংলাদেশের পাল-পার্বন-উৎসবের প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে তিনি যে আলোক সম্পাত করেছেন তা নানা কারণেই আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে রাখবে। বাঙালী হিন্দুর ধর্ম-কর্ম-আচার-আচরণ-বিধির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে তিনি প্রায় শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের বিবিধ বিষয়ে তিনি যে অক্ষয় সারস্বতকীর্তি রেখে গেলেন তা ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসু ও গবেষক সমাজের কাছে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে।

পরিশেষে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের রচনাশৈলী ও ভাষা সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। বহুপূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর এই বিশুদ্ধ গদ্যরীতির প্রশংসা করেছিলেন। ভাষার অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে তিনি খুবই সতর্ক। তাঁর রচনা আবেগবর্জিত ও সংহত। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর এই ভাষা ও গদ্য শৈলী আদর্শরূপে ব্যবহৃত হলে বাংলাভাষার শক্তিবৃদ্ধি হবে।

৭৩ বৎসর পূর্তির অব্যবহিত পরেই গত ১৭ জুন, ১৯৭২ তারিখে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ-জনিত রোগে চিন্তাহরণ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মৃত্যুতে বাংলার জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় নিবেদিত জীবন চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর শূন্যতা অচিরকাল মধ্যে পরিপূরিত হবে বলে মনে হয় না।

—শ্রীহারাধন দত্ত

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু (১৯০১-১৯৭২)

১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর কলিকাতায় অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু পরলোক গমন করেছেন।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর জন্মস্থান কলিকাতা। জন্মকাল ২২ জানুয়ারী, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। পাটনা শহরে তাঁর লেখা পড়ার সূচনা। পিতা উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশে সিভিল সার্জেন রূপে কাজ করতেন। পাটনা এংলো-সংস্কৃত স্কুলে অধ্যয়ন করেন ১৯০৬-১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—পরে কামারহাটী সাগর দত্ত ফ্রী স্কুলে যোগদান করেন (১৯১১-১২)। রাচি জিলা স্কুলে ও পুরী জিলা স্কুলে অধ্যয়নান্তে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ডিস্ট্রীক্ট স্কলারসিপ্ নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলেজীয় ছাত্র জীবন অতিক্রান্ত হয় স্কটিশচার্চ (১৯১৭-১৯ খৃঃ) ও প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৯১৯-২১ খৃঃ)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলকুমার ভূতত্ত্ব অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে বি. এসসি. পাশ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলকুমার আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে ভূতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন—কিন্তু ভূতত্ত্ব বিভাগের ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মাত্র তিন মাস পরে তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন--ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ অবলুপ্ত হয়। অতঃপর গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ ও নির্দেশে নির্মলকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে নৃতত্ত্ব বিভাগে (১৯২৩-২৫ খৃঃ) অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর স্থান সহ নৃতত্ত্বে এম, এসসি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অকৃতদার নির্মলকুমারের পরবর্তী জীবনধারা বহু বৈচিত্র্যময়।

আচার্য নির্মলকুমার ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৯২৯-৩০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩০ খৃঃ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের নৃতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন ১৯৪২ খৃঃ পর্যন্ত, ৪২-এর দেশ-ব্যাপী আন্দোলনকালে তিনি দ্বিতীয় বার কারাবরণ করেন। কারামুক্ত নির্মলকুমার ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিউম্যান জিওগ্রাফির' লেকচারার নিযুক্ত হয়ে পরে এই বিভাগের 'রীডার' পদে উন্নীত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাষ্ট্র বিজ্ঞান' বিভাগেও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমার আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ বিভাগ' এ পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো উইস্কনসিন ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতে সমাজ সংস্কৃতির

পরিবর্তন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৫৯ খৃঃ স্বদেশে ফেরার পর ভারত সরকার কর্তৃক তিনি অ্যানথ্রপলজিকাল সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া'র ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। এ সময়ে তিনি ভারত সরকারের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টাও ছিলেন।

এ. এস. আই, থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি দেশ ও জাতির বহুবিধ চিন্তা ভাবনা ও কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত রাখেন। ১৯৩০ খৃঃ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ভারতীয় সমাজ ও জাতিপ্রথা সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী করে তোলেন। অবশ্য এই ঘটনার অনেক আগে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্য পান এবং সামাজিক কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগের সূচনা এখানেই। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে আসামের পার্বত্য জাতি সমূহ সম্পর্কে যে সমীক্ষা দল গঠিত হয় নির্মলকুমার সেখানে আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন। ১৯৬৬ সালে নেফা সরকারের আমন্ত্রণে তিনি 'নেফার শিক্ষা সমস্যা' বিষয়ক একটি রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ খ্রীঃ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'অ্যাসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ্‌'-এর বাৎসরিক সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন" ও "মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন" সম্পর্কে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্‌ব্যতীত মেকসিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এশিয়ান ষ্টাডিজ্‌' বিভাগে এবং জাপানে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা সভায় যোগদান করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ স্মারক বক্তারূপে 'ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক এবং তাহাদের উন্নতি' বিষয়ে তিনি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এ বৎসরেই গাংটকে টিবেটোলজি ইনষ্টিটিউশনে দক্ষিণ এশিয়ার স্থাপত্য সম্পর্কে তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় এডভানসড ষ্টাডি প্রতিষ্ঠানে ''জাতীয় ঐক্য-সমস্যা' বিষয়ক নিবন্ধ পাঠ করেন এবং ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পাটনার "এ, এন, সিংহ ইনষ্টিটিউট্ অব সোসাল সায়েন্স'এ ''ভারতীয় জাতীয়তা-সমস্যা" সম্পর্কে ভাষণ দেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের নাম "গান্ধী এবং আধুনিক ভারত"। এই একই বৎসরে তিনি বিজয়চন্দ্র মেমোরিয়াল লেকচারার রূপে সমাজ বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসেবী বিজয়চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার বিষয় আলোচনা করেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার কলিকাতার বোস ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে দুইবার আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদানও করেছিলেন (১৯৬৫, ১৯৭১)।

নৃতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্ব-সমাজ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুব্যাপ্ত ক্ষেত্রে তিনি আজীবন বিচরণ করেছেন—তাঁর বিজ্ঞানী অনুসন্ধান ও গবেষণা নব নব

আবিষ্কারের সন্ধান এনে দিয়েছে। এদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক নির্মলকুমার একটি উজ্জ্বল নাম। নির্মলকুমার ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব সায়েন্‌স্ এর ফেলো ছিলেন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। এশিয়ার নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি নির্মলকুমারকে অন্নদাচরণ স্বর্ণপদক প্রদান করে সম্মানিত করেন (১৯৪৮)। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্‌স্ কংগ্রেসে তিনি—অ্যানথ্রপলজি ও আরকিয়লজি সেকশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি, নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য পুনরায় তাঁকে শরৎচন্দ্র রায় গোল্ড মেডাল্ প্রদান করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ক মৌলিক গবেষণার' জন্য তাঁকে' রাম প্রাণ গুপ্ত' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে নির্মলকুমার এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো এবং ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘকালের। সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতিরূপে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বহুবিধ কল্যাণকর্মের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার নির্মলকুমারকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় নির্মলকুমার মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিবের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের প্রচার ও প্রসারে নির্মলকুমারের নাম চিরস্মরণীয় থাকবে। গান্ধীজি সম্পর্কিত তাঁর বিপুল রচনারাজির মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক গান্ধী দর্শনের প্রবক্তা নির্মলকুমারকে খুঁজে পাবেন।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রধান ব্রত ছিল ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। এজন্য তিনি নৃতত্ত্বের পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান জিয়োগ্রাফি ও মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রন ঘটিয়েছিলেন। এই শতাব্দীর বিশের দশক থেকে এদেশের নৃতত্ত্ব বিশারদগণ নরকঙ্কাল ও মাথার খুলি সংগ্রহ করে এসেছেন। কিন্তু এগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন আলোচনা হয়নি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর তত্ত্বাবধানে সেই গবেষণা সুরু হয়। তাঁর গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে, প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের পিছনে বহির্দেশীয় প্রভাব তেমন কাজ করেনি। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও তথ্যনির্ভর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় বিজ্ঞানের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ ছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা করে ভারতবাসীর দৈহিক আকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলি বিশ্লেষণের কাজে হাত দেন। প্রসঙ্গতঃ রাচীর শরৎচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁকে এদেশের নৃ-বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। শরৎচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত "ম্যান ইন ইণ্ডিয়া"পত্রিকাখানির সম্পাদকরূপে তিনি প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য, লোক-সংস্কৃতি গ্রামজীবন, প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় আজীবন গবেষণা করেছেন। ইংরাজী,

বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় তিনি অনর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন। এ দেশের ও বিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আশা করা যায় নির্মলকুমারের কোন উত্তর সাধক এই সব মূল্যবান রচনার গ্রন্থরূপ প্রদান করবেন। এই সূত্রে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু রচিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ সমূহের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উপস্থিত করছি। বাংলা গ্রন্থ :—(১) ওড়িয়া শিল্প শাস্ত্র (১৯২৬) (২) কোনারকের বিবরণ (১৯২৬, ১৯৬০) (৩) নবীন ও প্রাচীন (১৯৩০, ১৯৪৯) (৪) দেশ-বিদেশ (১৯৩৯) (৫) গান্ধী রচনা সঙ্কলন (১৯৬৬) (৬) গান্ধীজি কি চান (১৯৪৬, ১৯৫৮,১৯৬১) (৭) গান্ধী চরিত (১৯৪৯, ১৯৬১) (৮) ভারতের গ্রামজীবন [১৯৬২] [৯] হিন্দু সমাজের গড়ন [১৯৪৯] [১০] পরিব্রাজকের ডায়েরী (১৯৪০,১৯৪৫, ১৯৪৯) [১১] কাজ ও গান্ধীবাদ [১৯৪৭] [১২] কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা [১৯৬৪] [১৩] গান্ধীমানস [১৯৬৭] [১৪] বিয়াল্লিশের বাংলা [১৯৭১] ২য় সং [১৫] বিদেশের চিঠি ১ঃ খণ্ড, [১৯৭১]

ইংরাজী গ্রন্থ : (1) Cultural Anthropology (1929, 1953, 1961), (2) Canons of Orissan Architecture (1932), (3) Excavation in Mayurbhanj (1948), (4) On the trail of Wolf children (1959), (5) Fifty years of Science in India : Progress of Anthropology and Archaeology (1963), (6) India : People (1969), (7) Culture and Society in India (1967), (8) Modern Bengal (1959), (9) Problems of National Integration (1967), (10) Problems of Indian Nationalism (1969); (11) Selections from Gandhi (1934, (5th Ed.) (1972), (12) Studies in Gandhism (1940, 3rd ed. 1962), (13) Truth and Non-violence (1949), (14) Gandhi : the man and his mission (1966), (15) My days with Gandhi (1953), (16) Gandhi and Indian Politics (1967), (17) Gandhism and Modern India (1970) (18) Lectures on Gandhism (1971) (19) Calcutta : A Social Survey (1968), (20) Tribal life in India (1971), (21) Some Indian Tribes (In the Press), (22) Problems of Democracy 1971 (?), (23) Anthropology and some Indian Problems (1972).

নির্মলকুমারের বিপুল গ্রন্থতালিকার দিকে দৃক্‌পাত করলে স্বভাবতঃ মনে হবে এ যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুধা ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন। নৃতত্ত্ব থেকে গান্ধীবাদ সবই তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'ভারতকোষের' অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নির্মলকুমার। আজীবন পরিব্রাজক নির্মলকুমার ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে ঘুরেছেন—মানুষকে অন্বেষণ করেছেন। সেজন্য তাঁর বিজ্ঞানী চেতনার অন্তরালে বয়ে চলেছে এক কবিপ্রাণতা, একটা দার্শনিক চেতনা। যাঁরা নির্মলকুমার-এর "পরিব্রাজকের ডায়েরী" "বিদেশের চিঠি" ও "নবীন ও প্রাচীন" পড়েছেন তাঁরা এই সত্য অন্তরের সংগে উপলব্ধি করেছেন। মানুষের অন্বেষণেই তাঁর জীবনব্যাপী

সাধনা। সকলশ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই ছিল তাঁর সৌহার্দ্য। গবেষণার ব্যাপারে সাহিত্য ইতিহাস থেকে কত বিচিত্র বিষয়ের ছাত্ররা তাঁর কাছে হাজির হতো—সকলেই তাঁর সাহায্য লাভ করে ফিরতো। তাঁর কাছে গবেষণা করে ডক্টরেট্ পেয়েছেন অনেকেই।

সারস্বত চর্চার সূচনা থেকে তিনি প্রত্নতত্ত্ব, বিশেষ করে এদেশের মন্দির স্থাপত্যের উপর অনন্য সাধারণ গবেষণা করেছিলেন—ইচ্ছা ছিল মন্দির স্থাপত্যের উপর তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবেন। সবই সংগ্রহ করেছিলেন—কিন্তু তার বাণীরূপ দিয়ে যেতে পারলেন না। পড়ে রইল তাঁর অসমাপ্ত কাজ। বঞ্চিত হলো ভারতভারতী। বাংলায় রচিত 'কোণারকের বিবরণ'—এতদ্‌বিষয়ে আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মন্দিরশিল্প বিষয়ক তাঁর শেষ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। মৃত্যুকালে তিনি বাংলার দুটি শ্রেষ্ঠ সারস্বত প্রতিষ্ঠান "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" ও "এশিয়াটিক সোসাইটির" সভাপতি ছিলেন। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট যুগের স্মৃতিচিহ্ন মুছে গেল—।

—শ্রীহারাধন দত্ত

শ্রীমতী ভেরা নভিকভা (১৯১৮-১৯৭২)

ভেরা নভিকভা ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতিগত মৈত্রী প্রবর্দ্ধনে একটি বিশিষ্ট নাম। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্য সেবার জন্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যপদে বৃত করে। ভারত-রুশ সংস্কৃতিগত মৈত্রীর আদর্শ স্থানীয় কর্মক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকায় ভেরা নভিকভা রুশসাহিত্যে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর অনুবাদ যেমন করিয়াছেন—তেমনি বঙ্কিম—প্রতিভার আবিষ্কারে বঙ্কিম-মননের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই যুগপুরুষের সাহিত্য-কৃতিকেও অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে গবেষণার স্বীকৃতিরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত ভেরা নভিকভার জন্ম হয় ১৯১৮ সালে এক চিকিৎসক পরিবারে। ১৯৩৫ সনে তিনি অধ্যয়নের জন্য লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিভাগে প্রবেশ করেন। এই সময় ইনি স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান্ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। সেই সঙ্গে স্বনামধন্য ভারতীয় বিপ্লবী দাউদ আলি দত্তের নিকট ভারতীয় জীবনের ও সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করেন। উত্তরকালে সর্বদা এই দুইজনের কথা তিনি গর্বের সহিত বলিতেন।

সম্ভবতঃ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপকতা সর্বাধিক ভেরা নভিকভা রবীন্দ্রনাথের বহুগ্রন্থ মূল বঙ্গভাষা হইতে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। বহু সুপরিচিত রবীন্দ্র কবিতা সোভিয়েতের বহুভাষায় অনুবাদে ভেরা নভিকভার অবদান স্মরণীয়। 'নৌকাডুবি,' 'গোরা,' 'ঘরে বাইরে,' প্রভৃতি উপন্যাস, গল্পগুচ্ছের বহু গল্প, 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি তাঁহার অনুবাদকর্মের স্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়াছে

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চায় নভিকভার আন্তরিকতা অকপট ছিল বলিয়া তাহা সুদূর লেনিনগ্রাদ ও কলিকাতার দূরত্ব বিদূরিত করিয়া বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতির সহিত সাহিত্যকর্মে তাঁহার আত্মার সংযোগ ঘটাইয়াছিল। লেনিনগ্রাদে তিনি বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যের ছাত্রী। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল বঙ্কিম সাহিত্য। এই গবেষণায় (থিসিস) তিনি ডক্টরেট লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম অবদান এবং দেশকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা তিনি ইতিহাস-বিচারে উপস্থাপিত করেন।

কলিকাতায় যখন তিনি আসেন—তখন তাঁহার মুখে বাঙ্গালাভাষায় কথা বলার ধরণ ও রীতি সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করে। তিনি বাংলা ভাষা লিখিতে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন—বলিতেও পারিতেন অতি প্রাঞ্জল সুন্দর ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রমেলায়—১৯৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে পার্কসার্কাস ময়দানে গাঢ় নীল রঙের সিল্কের পোষাকে তিনি যখন ঘোরাফেরা করিতেন তখন তাঁহার মুখে বাংলাভাষায় কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণ করিতেও তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে তাঁহার অধ্যয়ন ও অনুবাদ—গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিলনা—তিনি সাম্প্রতিকালের বহু বাঙ্গালী কবির কবিতাও রুশভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যের কথা সর্বদাই তিনি দুই দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে আনন্দের সহিত বলিতেন। রবীন্দ্র সাহিত্যও ভাবনায় উদ্বুদ্ধ এই বিদেশিনীর 'রবি-প্রভা' অভিধা সর্বাংশে সার্থক হইয়াছিল!

এক আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় ১০ এপ্রিল (১৯৭২) তারিখে বঙ্গ-সোভিয়েত তথা ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি গত মৈত্রীসাধনায় নিবেদিত প্রাণা এই বিদুষী মহিলার জীবনের অবসান হয়।

॥ অষ্টসপ্ততিতম বার্ষিক কার্য বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এই বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থিত করিতেছি। সূচনায় আলোচ্য কার্যকালের মধ্যে যে সকল সাহিত্যসেবী এবং দেশের কৃতীসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে কল্লোলযুগের প্রখ্যাত কথাশিল্পী সরোজকুমার রায়চৌধুরী (২৯ মার্চ, ১৯৭২), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্য এবং একান্ত সুহৃদ লীলামোহন সিংহরায় (২৩ বৈশাখ, ১৩৭৯ ৬মে ১৯৭২), প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (৩১ বৈশাখ '৭৯/১৪মে '৭২), ত্রিশ দশকে বাংলা ফুটবলের কৃতী খেলোয়াড় সূর্য চক্রবর্তী (১৫ চৈত্র '৭৮/ ২৯ মার্চ '৭২), দেশসেবক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, প্রখ্যাত গবেষক হরিহর শেঠ, যশস্বিনী কবি মৃণালিনী সেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ভেরা নভিকোভা, প্রখ্যাত গবেষক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (৩ আষাঢ় ১৩৭৯/১৭ জুন '৭২) পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের ঘাটতিপূরণের জন্য এককালীন দান হিসাবে ১১,০০০ টাকা মঞ্জুর করায় আর্থিক অবস্থার চিত্র কিছু উন্নত প্রতীয়মান হইতেছে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিষদের কর্মীগণের বেতনহার অত্যন্ত করুণ এবং নগণ্য। বর্তমানের বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের কর্মীগণের বেতন বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বেতন-বৃদ্ধি করিতে গেলে সরকারী অর্থসাহায্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কার্য নির্বাহক সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির ৩টি সাধারণ অধিবেশন ও ২টি জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। (৭৮তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লেখিত হইল)

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত হইল।

সভাসমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা ঃ উদ্বোধন (১০ই বৈশাখ ১৩৭৯)

সভাপতি : শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা ২য় বক্তৃতা (১৬ই বৈশাখ ১৩৭৯)

১। বিষয় : বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি আলোচনার পদ্ধতি

বক্তা : শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়

২। বিষয় : বাংলার পটুয়া সংগীত

বক্তা : শ্রীসুহৃদ ভৌমিক

সভাপতি : শ্রীমানিক সরকার

ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা : ৩য় বক্তৃতা (১৭ বৈশাখ ১৩৭৯)

বিষয় : বাংলার পাল এবং সেন যুগীয় মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি ও গঠন-কৌশল।

সভাপতি : শ্রীঅনিলচন্দ্র পাল

বক্তা : শ্রীদীপক রঞ্জন দাস

ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা ঃ ৪র্থ বক্তৃতা (২০ বৈশাখ, '৭৯)

বিষয় : বাংলার মন্দিরের স্থপতিগণ

সভাপতি : শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীতারাপদ সাঁতরা

ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা ঃ ৫ম বক্তৃতা (২৪ বৈশাখ ১৩৭৯)

বিষয় : পোড়ামাটির কাজের বৈশিষ্ট্য

সভাপতি : শ্রীরাধারমণ মিত্র

বক্তা : শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর রচনা পাঠ করেন শ্রীদীপক রঞ্জন দাস।

কলিকাতা রোটারি ক্লাবের বুক ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন (৩জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯)

সভাপতি : শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ

বক্তা : শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য

রামমোহন দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসব সভা, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

(রাধানগর রামমোহন দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসব কমিটির সহযোগিতায়)

সভাপতি : শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় (শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

বক্তা : শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীধীরাজ বসু।

পুস্তক প্রকাশ

বর্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :

১। একেন্দ্রনাথ ঘোষ (সা, সা, চ,—১১১)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

২। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সূচী— ঐ

বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

ভারত কোষ

ভারতকোষের ৫ খণ্ড প্রকাশের ব্যয়নির্বাহের জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফাউণ্ডেশন ফর টেকষ্ট বুক প্রোডাকৃশান সংস্থার মাধ্যমে এবৎসর দ্বিতীয় কিস্তিতে মোট ৩৫,০০০৲ টাকা মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান পাওয়া গিয়াছে। ভারতকোষের ৫ম খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আগামী বৎসরের মধ্যেই ইহার প্রকাশনকার্য সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

স্মারক গ্রন্থ

৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য স্মারকগ্রন্থ শ্রীসরস্বতী প্রেস, লিমিটেডে মুদ্রিত হইতেছে।

পুথিশালা

আলোচ্যবর্ষে পুথিশালার সর্বপ্রকার পুথির সংখ্যা ছিল ৬২২৭। বর্তমান বৎসরে কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। ইহাদের বিষয়-বিভাগ নিম্নরূপ বাংলা : ৩৩৭১, সংস্কৃত ২৫৯৯, তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ১৩। আলোচ্য বর্ষে ১০০টি সংস্কৃত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং ২০৮টি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুথির মাইক্রোফিলম করা হইয়াছে। মোট ১১জন পাঠক-পাঠিকা এ বৎসর ৪৪টি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন।

পরিষদ সম্পদ সংরক্ষণ

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট লিখিত ১৯মে ১৯৭২ তারিখের পত্রে কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমদনমোহন কুমার দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য প্রত্নবস্তু ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা প্রভৃতি যথোচিতভাবে সংরক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কার্যনির্বাহক সমিতির ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ (ইংরাজী ১১ জুন ১৯৭২) তারিখের জরুরী সভায় 'পরিষদ্-সম্পদ-সংরক্ষণ ও পরিচালন তদন্ত কমিটি' নিয়োগ করা হইয়াছে। উক্ত তদন্ত কমিটি তাঁহাদের অনুসন্ধান সন্তোষজনক ভাবে করিতেছেন। আশা করা যায় তাঁহারা অনতি বিলম্বে তাঁহাদের তদন্তের ফলাফল কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থশালার কার্য্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রন্থশালা মোট ২৭১ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৭৭৬২ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৪.৫ জন) পাঠক পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার মধ্যে লেনদেন বিভাগে মোট ২৬১ দিন কাজ হয় এবং ৩৮২৫ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৪.৬ জন) পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। পাঠকক্ষে ২৭১ দিন কাজ হয় এবং ৩৯৩৭ জন (অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ১৪.৫) পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত থাকেন। পাঠকক্ষ এবং লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। ইহা ব্যতীত এবৎসর সদস্য নহেন এমন ৫১ জন ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহারা মোট ১১৩ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন।

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৭.৪৫১ খানি পুস্তকের (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩২.৬ খানি) আদান প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেনদেন পত্রকের সাহায্যে ৬৬০৬ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৫.৩ খানি) ও পাঠকক্ষে ১০৮৪৫ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪০.৫ খানি) পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয় অনুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট 'গ'—এ দেওয়া হইল।

গ্রন্থশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। ধূপন-প্রকোষ্ঠে (ফিউমিগেশান চেম্বার) এ বৎসর ৩৮৭ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন ও জীর্ণ পুথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থাভাববশতঃ পুস্তক বাঁধাই এর কাজও প্রয়োজনানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। এবিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে পরিষদ গ্রন্থাগারে মোট ৩৫৭ খানি পুস্তক উপহৃত হয়; তাহাদের মূল্য ১৪১৭.১৮ টাকা। গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (ইনডেক্সড্) পুস্তক তালিকা পরিশিষ্ট 'ঘ'—এ দেওয়া গেল।

(স্বাঃ) নির্মলকুমার বসু
সভাপতি
(১০. ৩. ১৩৭৯)

পরিশিষ্ট—ক

৭৮তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম

সভাপতি : শ্রীনির্মল কুমার বসু
সহঃ সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীপুলিন বিহারী সেন
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
শ্রীকালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত

সহঃ সভাপতি,
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদক : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সহঃ সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ
শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল
চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীতারাপদ সাঁতরা
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীশঙ্খ ঘোষ
পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীউষা সেন
পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য

সর্বশ্রীকুমারেশ ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, পুলকেশ দে সরকার, দেবকুমার বসু, মনোমোহন ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বাস, অমলেন্দু ঘোষ, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমার, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিবদাস চক্রবর্তী, হারাধন দত্ত, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র গুপ্ত, দিলীপকুমার মিত্র, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাখা প্রতিনিধি : সর্বশ্রী অতুল্যচরণ দে পুরাণ রত্ন—নৈহাটী শাখা
লক্ষ্মীকান্ত নাগ —বিষ্ণুপুর শাখা
সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় —মেদিনীপুর শাখা

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর

বিশিষ্ট সদস্য : সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ।

আজীবন সদস্য সর্বশ্রী সত্যচরণ সাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাঁদ পাণ্ডে, লীলামোহন সিংহ রায়, প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ইন্দুভূষণ বিদ্, ত্রিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, নির্মলকুমার বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাকান্ত দে, বিভূভূষণ চৌধুরী, অজিত বসু, অনিলকুমার রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভূষণ চক্রবর্তী, সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমালা দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রঞ্জিতকুমার দাস, শিবেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী চৌধুরী, অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কানাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখার্জি, গিরীন্দ্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ বসু, অতীশচন্দ্র সিংহ, দুলুপ্রসাদ

বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, মধুসূদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাশ, অরুণকুমার সেন।

সাধারণ সদস্য সংখ্যা : ১৪৭ জন

মফঃস্বল সদস্য সংখ্যা : ২৫ জন

পরিশিষ্ট—গ

পুস্তক আদান প্রদান—১৩৭৮

বিষয়ানুযায়ী

বিষয়	লেনদেন	পাঠক	মোট
দর্শন (১০০)	৬৫	১১৮	১৮৩
ধর্ম (২০০)	২১১	৩২৪	৫৩৫
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	৬২	৪৫৯	৫২১
শিক্ষা (৩৭০)	২৫	৩২	৫৭
ভাষা (৪০০)	৪৫	৬১	১০৬
বিজ্ঞান (৫০০)	১৪	৪৬	৬০
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০)	১৭	২৮	৪৫
শিল্প কলা (৭০০)	১৫	৫৫	৭০
সঙ্গীত (৭৮০)	৪৮	১৫৮	২০৬
সাহিত্য (৮০০)	৫৪০০	২৭৭৮	৮১৭৮
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১১৪	৬৬	১৮০
জীবনী (৯২০)	৩৯১	৫২১	৯১২
ইতিহাস (৯৩০-৯৯০)	১৪৪	৪০৩	৫৪৭
সহাঃ গ্রন্থ (০০০)	৫৫	৫০৮	৫৬৩
পত্রপত্রিকা		৫২৮৮	৫২৮৮
	৬৬০৬	১০৮৪৫	১৭৪৫১

ভাষানুযায়ী (১৩৭৮)

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৬৪৯৬	৯৮৬০	১৬৩৫৬
ইংরাজী	৯৪	৯২৩	১০১৭
সংস্কৃত	১৬	৬২	৭৮
	৬৬০৬	১০৮৪৫	১৭৪৫১

পরিশিষ্ট—ঘ

মোট পঞ্জীকৃত পুস্তক (১৩৭৮)

গ্রন্থাগারে মোট পঞ্জিকৃত পুস্তক তালিকা —৫২০

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেন্ট্রাল) রুলস এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল :—

১। প্রকাশ স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড্, কলিকাত-৬

২। প্রকাশ কাল—ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রাকর—শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য, শোভনা প্রেস, ১।১ জ্ঞাননগর রোড, কলিকাতা-১৭
ভারতীয় নাগরিক

৪। প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন কুমার,
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬
ভারতীয় নাগরিক

৫। সম্পাদক—শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত
২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬
ভারতীয় নাগরিক

৬। (ক) যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদ পত্রের মালিক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

আমি, শ্রীমদনমোহন কুমার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) শ্রীমদনমোহন কুমার
প্রকাশক
(সম্পাদক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

তারিখ ২৫-৩-১৯৭৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

গ্রন্থ-বিক্রয় বিভাগ

গ্রন্থবিক্রয় বিভাগ প্রত্যহ ১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকে।

কমিশনের হার

পরিষদ্-সদস্য, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থকার পক্ষে

১—৪৯৯ টাকা পর্যন্ত ১৫%

৫০০—৯৯৯ " " ২০%

১০০০ এবং তদূর্ধ্ব " ২৫%

সর্বক্ষেত্রে প্রেরণ খরচ স্বতন্ত্র এবং তাহা ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। ভি. পি. পি-র ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াং মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য।

ভারতকোষ

১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ৫ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

মুল্য: ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড ২০.০০ (কুড়ি টাকা) হিসাবে প্রতি খণ্ড,

৪র্থ খণ্ড (দশ টাকা)

অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরণ করা যায়। অন্যূন ১০ খণ্ড লইলে গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৬
ফোন—৫৫-৩৭৪৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৯তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতি

শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার
শ্রীপুলিন বিহারী সেন
শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহারাধন দত্ত
শ্রীসুধীর কুমার নন্দী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ রায়
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীভবতোষ দত্ত
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য
পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ২। শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ৪। শ্রীকামিনী কুমার রায় ৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ৬। শ্রীকুমারেশ ঘোষ ৭। শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র ৮। শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ৯। শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ১০। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১১। শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ১৩। শ্রীদেবকুমার বসু ১৪। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫। রেভাং ফাদার পি. ফালো এস জে ১৬। শ্রীপ্রবোধ কুমার ঘোষ ১৭। শ্রীমনোমোহন ঘোষ ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুহরায় ১৯। শ্রীসন্তোষ কুমার বসাক ২০। শ্রীহীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

শাখা প্রতিনিধি

১। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর) ২। শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)

প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন কুমার
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক—অশোক ভট্টাচার্য
শোভনা প্রেস
১।১, জানগর রোড,
কলিকাতা-১৭